

କୃଷି ଗାନ୍ଧୀ

ପୁସ୍ତିକ ଇହିତେ ଆଧୁନିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିখ୍ୟାତ
କୃଷି ଗାନ୍ଧୀର ଅନୁବାଦ

ଅନୁବାଦକ : ଅମଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

ପୁସ୍ତିକ
୨୨, କର୍ମଓୟାଲିସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍,
କଲିକାତା

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৫২

দাম দুই টাকা

৬-৬০২

১১৫।এ, আমহার্ট ষ্ট্রিট, কলিকাতা, মনোমোহিনী প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত
চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট, কলিকাতা,
পুথিঘরের পক্ষ হইতে সতীশ বাঘ কর্তৃক প্রকাশিত

ইক্ষাপোনের রাণী

পুস্কিন

রক্ষীদের লেফ্টেন্যান্ট নারুমভের বাড়ীতে তাসের আড্ডা চ'লেছে। শীতের দীর্ঘ রাতটা অলক্ষিতভাবেই কেটে গেছে। রাতের খাবার দেওয়া হ'লো সকাল পাঁচটায়। বিজয়ীর দল গোথ্রাসে খাবার গিলছে। অন্যত্রেরা অনামনস্বভাবে তাদের শূন্য স্থানে ব'সে। শ্যাম্পেন আসার সাথে সাথে সকলের কথাই বেশ উদ্দীপনাপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। গৃহস্থামী জিজ্ঞেস ক'রলেন, “তোমার অবস্থা কিহে সুরিন?”

“সেই সনাতন হার। আমার ভাগ্য খুবই খারাপ। আমি মিরাগোল' খেলি, মেজাজ শান্ত রাগি, কখনও উত্তেজিত হইনা—অথচ বরাবরই আমি হারি।”

“অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও যে, ‘লাল’ টাকে ধরবার জন্য তুমি কখনই প্রলুব্ধ হও নি, কেমন? তোমার মানসিক শক্তি আমাকে বিস্মিতই করে।”

“আর হারম্যান সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর”—একজন তরুণ ইজিনি-য়ারকে লক্ষ্য ক'রে কে একজন মন্তব্য ক'রলে। “জীবনে সে কোনদিন তাসই ছোঁয় নি—বাজী ধরে খেল। তো দূরের কথা। অথচ এই সকাল পাঁচটা পর্যন্ত সে আমাদের খেলা ব'সে ব'সে দেখ'ছে।”

“তাসে আমার অত্যন্ত আকর্ষণ,” হারম্যান ব'লে উঠলে। “কিন্তু আমার অবস্থা এমনি যে এক অনিশ্চিত বিলাসের আশায় আমার প্রয়োজনকে জলাঞ্জলি দিতে রাজী নই।”

টমস্কি ব'ললে, “হারম্যান একজন জার্মান এবং খুব হ'সিয়ার লোক। ওঁতে আমি আশ্চর্য্য হইনা, অদ্বুত হ'চ্ছে আমার ঠাকুমা প্রিন্সেস অ্যানা ফেভোরোভনা।”

“কেমন? কেন?” সকলে একসঙ্গে চীৎকার ক’রে উঠলেন।

টম্‌স্কি বলতে লাগলে, “আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না তিনি কখনই গেলেন না কেন।”

নাক্ষত্র বললে, “ওতে আশ্চর্যের কিছুই নেই; তোমার মনে রাগ। উচিত যে উনি একজন আশী বছরের বৃদ্ধ।”

“ওঁর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান কি তুমি?”

“না, কিছুই জানি না।”

“আচ্ছা, তা’হলে আগিই বলি। ষাট বছর আগে উনি একবার প্যারিসে গিয়ে অনেকের নজরে প’ড়ে যান। লোকে ‘মস্কোর উর্বরী’কে দেখবার জন্য ওঁর গাড়ীর দিকে ছুটে থাকে। রিণলিউ ওঁকে প্রণয় জানান। ঠাকুমা শপথ ক’রে বলেন যে, তাঁর উপেক্ষার জন্য রিণলিউ প্রায় আত্মহত্যা ক’রতে ব’সেছিলো। সেকালে মেয়েরা ‘ফ্যারো’ খেলতো। একদিন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে তিনি ডিউক অব অরলিন্সের কাছে অনেক টাকা হেরে যান। বাড়ী পৌছে ঠাকুমা স্বপ্নের বেশভূষাগুলো গা থেকে খুলে ফেলেন, পরে ঠাকুর্দাকে তাঁর হারের কথা জানিয়ে কিছু টাকা ধার চান। আমার ঠাকুর্দা, তিনি অবশ্য এখন মরে গেছেন, তবে যতদূর মনে পড়ে আমার, স্ত্রীর কাছে তিনি ছিলেন ঠিক একজন দেওয়ানের মত—আর ওঁকে ভয়ও ক’রতেন মারাত্মক রকম। তা’সঙ্গেও তাঁর হারের কথা শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। এক তাড়া বিল বের ক’রে তিনি দেখালেন যে, ছ’মাসের মধ্যেই উনি লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখালেন, প্যারিসে মস্কোর এবং স্ত্রারটোরভের সম্পত্তি বিক্রী করার স্বেচ্ছা নেই। এর ফল হলো এই যে, তিনি টাকা দিতে ডাহা অস্বীকার ক’রে ব’সলেন। ঠাকুমা তাঁর কাণ ম’লে দিয়ে, তাঁর রাগ দেখাবার জন্য আলাদা গিয়ে গুলেন। সকালে স্বামীকে ডেকে পাঠালেন, আশা, এই দাম্পত্য বিরহের কিছু

প্রতিক্রিয়া ঠাঁর ওপর হবে। কিন্তু তাঁকে অনমনীয় দেখা গেলো। জীবনের সর্বপ্রথম ঠাকুমা যুক্তি এবং ব্যাখ্যার হীনতা স্বীকার ক'রলেন। তিনি বললেন, ঋণের মধ্যে পার্থক্য আছে; আর একজন 'প্রিন্স'এর সাথে তো আর কোচ'ম্যানের মত ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় কোন ফল হ'লো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প'ড়লেন তিনি। একজন বিশিষ্ট লোকের সাথে তাঁর হঠাৎ একটু আলাপ হ'য়ে যায়। কাউন্ট সেন্ট জার্মেণের নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। ঠাঁর সম্বন্ধে কত অদ্ভুত সব গল্প শোনা যায়। পর্যটক ইহুদির মত তাঁর খ্যাতি ছিলো। তাঁর কাছে অমর হবার অমৃত এবং পরশ-পাথর আছে বলে মনে করা হ'তো। কেউ কেউ তাঁকে প্রবঞ্চক ব'লে ঠাওরাতো; তাঁর জীবনীতে লেখা আছে,—তিনি একজন 'স্পাই' ছিলেন। যাই হোক, তাঁর রহস্যময়তা সহেও, জার্মেণের চেহা'বায় বেশ সৌম্যভাব ছিলো, আর তাঁর ব্যবহারও ছিলো অত্যন্ত মার্জিত। ঠাকুমা এখনও তাঁর কথা ভাবেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে কোন অসম্মানজনক উক্তি কেউ ক'রলে বেগে ওঠেন। ঠাকুমা জানতেন জার্মেণ ইচ্ছা ক'রলে প্রচুর টাকা এনে দিতে পারেন, সুতরাং তাঁর কাছে আবেদন জানাতে সক্ষম ক'রলেন। একটা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর সাথে অনতিবিলম্বে দেখা ক'ববার জন্ত ব'ললেন। সেই অদ্ভুত বুড়ো লোকটা এসে ঠাঁকে ভয়ানক শোকার্ত দেখতে পেলেন। ঠাকুমা জঘন্য বং ফলিয়ে স্বামীর বর্ষবতাব বর্ণনা দিলেন, এবং শেষে ব'ললেন যে, তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা শুধু তাঁর বন্ধুত্ব এবং আগ্রহের উপর নির্ভর ক'রছে। একটু ভেবে সেন্ট জার্মেণ ব'ললেন, 'টাকা আমি আপনাকে দার দিতে পারি, কিন্তু আমি জানি, আমার টাকা শোধ না করা পর্যন্ত আপনি শাস্তিতে থাকতে পারবেন না; আমিও আপনাকে আরও উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন ক'রতে চাই না। অত্ৰ একটা পথ আছে। আপনি আবার টাকা জিতে নিতে পারেন।' ঠাকুমা বাধা দিয়ে ব'ললেন,

‘কিন্তু প্রিয় কাউন্ট মশায়, আপনি কি বুঝছেন না, যে আমাদের টাকা পক্ষা একেবারেই নেই’? জার্জের উত্তর ক’রলেন, ‘টাকার আপনান্ন প্রয়োজন নেই। আমার কথা শুনুন।’ বলেই তিনি একটা গোপনীয় কথা ওকে বললেন; ও কথাটা জানবার জন্য আমরাও অনেক কিছু দিতে রাজী হব।

তরুণ খেলোয়াড়রা আরও মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনতে লাগল। টম্‌স্কি পাইপ ধরিয়ে হু’এক টান দিয়ে বলতে লাগল,—“সেই দিনই সন্ধ্যায় ঠাকুমা ভাসিলিসে গিয়ে হাডির হ’লেন। ‘ডিউক অব অরলিন্স’ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, ঠাকুমা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, আর দেনা-শোধের টাকা না আনতে পারার কৈফিয়ৎ স্বরূপ হু’একটা কথা বানিয়ে ব’লে খেলতে ব’সে গেলেন। তিনটা তাস বেছে নিয়ে তিনি পর পর বসালেন। সববায়ই তাঁর জিত হ’লো। ঠাকুমাও ঋণের হাত থেকে মুক্তি পেলেন।”

—“নিছক ভাগ্য আর কি!” একজন মন্তব্য ক’রলেন।

—“পরীর গল্প”, হারম্যান বললে।

—“তাসগুলোব চিহ্ন ছিলো”—তৃতীয়জন বলে উঠলে।

গম্ভীরভাবে উত্তর দিল টম্‌স্কি—“আমি সেটা মনে করি না।”

—“তুমি কি বলতে চাও তোমার ঠাকুমা পর পর তিনখানা জিতের তাসেরই আন্দাজ করতে পারেন?” নার্সমথ শুধালে।

—“হ্যাঁ”, টম্‌স্কি উত্তর ক’রলে। “তার ছেলে ছিলো চারটি—আমার বাবা তাব মধ্যে একজন। ওরা সকলেই ছিলো পাকা জুয়ারী। তাদের এবং আমার কাছে এর মূল্য থাকলেও তিনি কাক কাছেই তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আমার খুড়ো কাউন্ট আইভ্যান্‌ ইলিচ আমাকে শপথ করে বলেছিলেন, স্বর্গীয় চ্যাপলিন্স্কী যে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলো, সেই জোরিচের

কাছে একবার তিন লক্ষ রুবল্ হেরে যায়; —আমার মনে হয় এটা ঠিক। ঠাকুমা, যিনি ঘর-পালানো ছেলেদের ওপর কঠোর ছিলেন, কোন কারণে চ্যাপ্লিন্সির ওপর তাঁর দয়া হয়। তিনি ঠুঁকে তিনটে তাস দেন, যেগুলোকে পর পর বসাতে হবে, আর একটা শপথ তাকে করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি, জীবনে আর কোনো দিন সে খেলবে না। চ্যাপ্লিন্সী জোরিচের বাড়ীতে গিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। প্রথম তাসটার উপর সে পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজী ধরে জিতে নেয়—পরে আরও, অর্থাৎ হারের পরিমাণের চেয়ে জিতের পরিমাণ বেশি না হওয়া পর্যন্ত। যাক, এখন ঘুমানো যাক। প্রায় ছটা বাজে।”

ভোর হ’য়ে আসছিলো। মাস শেষ ক’রে যে দাব পথে চ’লে গেলো।

[২]

রুকা কাউন্টস্ তাঁর ‘ড্রেসিং রুমে’ আয়নার সামনে ব’সে-ছিলেন; তিন জন পরিচারিকা তাঁর সেবায় নিযুক্ত। একজন মেয়েছেলে ‘রুজের’ বো দিয়ে মুখে রং করে। পাত্র নিয়ে, এক বাস্ম পিন্ নিয়ে দাঁড়িয়ে আর একজন, ... তৃতীয় জন ধোয়াটে রংএব ক্রিতে জড়ানো ‘নাইট ক্যাপ’ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সৌন্দর্যের একটু আভাসও কাউন্টসের নেই। বহু আগেই তা শুকিয়ে গেছে; কিন্তু যৌবনের সব অভ্যাসই তিনি জীইয়ে রেখেছেন; যন্ত্রের সাথে সেই সেকলে ফ্যাসান্ অঙ্গসরণ ক’রে চলেছেন, আর সেই ষাট বছর আগের মতই প্রধান-দ্রব্যের উপর সময় ব্যয় ক’রে থাকেন। তাঁর সঙ্গী একটা ‘এম্ব্রয়ডারি ফ্রেম্’ নিয়ে জানলার ওপর ব’সে ছিলো।

—“সুপ্রভাত; ঠাকুমা”—একজন যুবক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে।
আমি একটা কথা জানতে এসেছি ঠাকুমা।”

—“কি, পল?”

“একজন বন্ধুকে কি তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, আর, শুক্রবারে ‘বলে’ তা’কে আনতে পারা যায়?”

—“হ্যাঁ, তাকে ‘বলে’ নিয়ে এসো এবং আমার সাথে আলাপ করিয়ে দ্বিণ। তুমি কি কাল.....গিয়েছিলে?”

—“হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। খুবই আমোদে কেটেছিলো। নেচেছিলাম আমরা পাঁচটা অবধি। মাদমোয়াজেল এলেক্সা দেখতে চমৎকার।”

“চমৎকার! তুমি সহজেই আনন্দিত হও..... তার ঠাকুমা প্রিন্সেস্ ডেরিয়া পেট্রোভনার সাথে তোমাব দেখা করা উচিত ছিলো। ও আমাকে প্রিন্সেস্ ডেরিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়—নিশ্চয়ই খুববুড়া হ’য়ে গেছে সে।”

“কিন্তু তিনি তো সাত বছর আগে মারা গেছেন ঠাকুমা!”—
অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয় টমস্কি, ছোট মেয়েটি মাথা তুলে ওকে একটু ইসারা করে। বুঝলে সে, যে এটা একটা অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত, ঠাকুমাকে তাঁর সঙ্গীর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া চলে না ভেবে, ঠোট কামড়িয়ে ধরলে সে।

তার এই খবরকে পরম ঐদাস্তভরে গ্রহণ করলেন তিনি।

—“মারা গেছে?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। “আর আমি জানি না! একই সাথে আমরা দুজনে সম্মান লাভ করি। আমরা ভগ্নাস্থ হ’লে সম্রাট.....

অন্ততঃ এই নিয়ে একশোবার সেই একই গল্প কাউন্টেন্স ওদের কাছে ক’বলেন।

“আমায় একটু সাহায্য কর ভাই পল।” পরে তিনি ব’ললেন—
“নিজাঙ্ক আমার নস্তির কোটোটা কোথায়?”

পরিচারিকাদের সাথে তিনি পদ্মাব আড়ালে চ’লে গেলেন। টমস্কি মেয়েটির সঙ্গে র’য়ে গেলো।

—“তোমার বন্ধুটি কে, যার সাথে তুমি আলাপ করিয়ে দিতে চাও?”—লিজাভেটা আইভ্যানোভ্‌না যুহুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

—“নার্কেমত, তুমি কি তাঁকে জান?”

—“না। তিনি কি সৈনিক, না নাগরিক?”

—“একজন সৈনিক।”

—“এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে কি?”

—“না, অখারোহীদের মধ্যে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ব’লে ভাবলে কেন তুমি?”

মেয়েটা একটু হাসলে; কোন উত্তর ক’রলে না।

—“পল!” পর্দার আড়াল থেকে কাউন্টেন্স ডাকলেন। “একখানা নতুন নভেল একটু দেখে পাঠিও না আমার জন্তে—শুধু দেখো, যেন আধুনিক না হয়।”

—“তা হ’লে নতুন বই কি ক’রে পাঠাব ঠাকুমা?”

—“অর্থাৎ আমি এমন নভেলের কথা বলছিলাম যার নায়ক তার বাপ-মাকে গলা টিপে মারেনি। আর যার মধ্যে জলে ডুবে মরার মত কোন ঘটনা নেই। জলে ডুবে মরার দৃশ্য আমি সহ্যে পারি না। আজকাল কি সে রকম নভেল বেরিয়েছে?”

—“তুমি কি রাশিয়ান বই পছন্দ কর?”

“রাশিয়ান নভেল আছে? তা’হলে একখানা পাঠানই চাই পল।”

—“আমি দুঃখিত ঠাকুমা! আমাকে যেতেই হবে। দুঃখিত লিজাভেটা আইভ্যানোভ্‌না। তুমি কেন মনে করলে যে নার্কমত এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের?”

টম্‌স্কি বিদায় নিলে।

লিজাভেটা আইভ্যানোভনা একাই রয়ে গেলো। কাজ বন্ধ ক'রে সে জানালা দিয়ে চেয়ে রইলো। একটু পরে একজন তরুণ অফিসার রাস্তার কোন্টার এসে উপস্থিত হলো। লিজাভেটার মুখের উপর একটা লাল আভা ফুটে উঠল। ক্যানভাসের উপর পড়ে সে মাথা নীচু ক'রে ফের কাজ শুরু ক'রলো। ঠিক সে সময় কাউন্টেন্স পুরো সাজগোজ ক'রে ঢুকলেন।

“গাড়ীটা জুড়তে বল লিজাক্সা”, তিনি বললেন, “আমরা একটু বেড়াতে যাব ;

ফ্রেমটা খুঁয়ে লিজাক্সা উঠে তার কাজের জিনিসপত্রগুলোকে সরিয়ে রাখলো।

“তুমি কি বলয়া ?” কাউন্টেন্স চীৎকার করে বললেন। “একনি গাড়ীটাকে ঠিক ক'রতে বল !”

“যাচ্ছি এখনই”, শাস্তভাবে বালিকা উত্তর করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

একজন ভৃত্য ঢুকে প্রিন্স পনের দেওয়া একখানা বই কাউন্টেন্সকে দিল।

“প্রিন্সকে আমার ধন্যবাদ জানিও। লিজাক্সা, ও লিজাক্সা—কোথায় উড়ে গেলে তুমি ?”

—“আমার কাপড় চোপার প'ড়তে।”

—“যথেষ্ট সময় আছে এখনও। ব'সো এখানে। প্রথম খণ্ড খুলে জোরে জোরে পড়তো।”

বইটা নিয়ে মেয়েটা প'ড়তে লাগলো।

—“একটু জোরে পড়তে পার না ?” কাউন্টেন্স ব'ললেন। “তুমি কি ঘুমচ্ছো ? একটু দেরী কর। একখানা ছোট টুল এনে দাও আমাকে। আর একটু কাছে সরিয়ে দাও।”

আইভ্যানোভনা কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে গেলো। কাউন্টেন্স হাই তুলতে লাগলেন।

—“বইটা বন্ধ কর,” তিনি বললেন। “কি বিজ্ঞী বইটা! আমার খন্যবাদ জানিয়ে পল্কে বইটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো। গাড়ীটা কি তৈরী হ’য়েছে?”

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আইভ্যানোভনা বললে, “হ্যাঁ”।

—“পোষাক পরনি কেন তুমি?” কাউন্টেন্স জিজ্ঞাসা করলেন। “তোমার জন্ম রোজই দেরী ক’রতে হয়। তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না দেখছি”।

লিজা চটে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলে। দু মিনিট বেজেছে কি না বেজেছে অমনি কাউন্টেন্স জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে উঠলেন। তিনজন পরিচারিকা এক দরজা দিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকলো, আর এক দরজা দিয়ে এসে ঢুকলো একজন খানসামা।

—“তোমরা কাণে শুনতে পাওনা কেন বলতে পার?” কাউন্টেন্স জানতে চাইলেন। “আইভ্যানোভনাকে বল, আমি তার জন্ম অপেক্ষা ক’রছি।

আইভ্যানোভনা একটা ঢিলে পোষাক পরে হ্যাট একটা মাথায় চাপিয়ে এসে প্রবেশ করলে।

“শেষ পর্যন্ত এলে!” —বলে কাউন্টেন্স ওকে সম্বন্ধনা ক’রলেন। বা: কি চটকদার পোষাক, একেবারে অনাবশ্যক। মন তোলাবার ম’ল কেউ নেই।আবহাওয়াটা কেমন? জোব বাতাস বইছে বলে মনে হয়।”

—“না রাণী মা, বাতাস নেই”—খানসামা বললে।

“তুমি কি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ? জানলাটা খোল, ওই দেখ কেমন বাতাস, আর ঠাণ্ডাও বটে—ওই বাতাস। লিজাকা, আমার গাড়ীর

দরকার নেই। আমরা আজ বেড়াতে যাচ্ছি না, আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার চমৎকার পোষাকটা মাঠেই মারা গেলো।”

—“কি জীবন”!—লিজাঙ্কা আইভ্যানোত্‌না ভাবলে।

লিজাভেটার জীবনটা বাস্তবিক বড়ই দুর্কিসহ। দাস্তে ব'লেছিলেন অন্তের ক্রটি বড়ই তেঁতো, আর পরের বাড়ীর সিঁড়ির ধাপে পদক্ষেপ করা বড়ই কঠিন। প্রখ্যাত কোন প্রাচীন সম্রাটবংশীয় মহিলার অন্তগ্রহপুষ্ট সাথী ছাড়া পরাধীনতার জ্বালা কে বেশী অন্তভব ক'রতে পারে? কাউন্টেস্‌এর অন্তরটা ঠিক খারাপ নয়। সংসারই তাঁর অধঃপতনের জন্ত দায়ী—কলে, তিনি খেয়ালী, নীচ এবং উকত হয়ে উঠেছেন, ঠিক সেই সমস্ত প্রাচীন অহঙ্কারী লোকের মত, যারা তাদের কালে সমাদর পেয়ে এসেছে, কিন্তু বর্তমানে তাদের কোন স্থান নেই। সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি আজও যোগ দিয়ে থাকেন, কোনরকমে নিজকে টেনে নিয়ে যান 'বলে'—পাউডার ইত্যাদি মেখে এবং সেকালের বেশভূষা পরে সেখানে গিয়ে এক কোণে ব'সে থাকেন। দুরন্ত এবং ভয়ানক তাঁর এই উপস্থিতি। নিমন্ত্রিতেরা ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে যায়, কিন্তু পরে কেউ তাঁর দিকে একটুও মনোযোগ দেয় না। নিজের বাড়ীতে সহরস্বদ্ধ লোককে তিনি ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু একখানা মুখও তিনি চিনতে পারেন না। তাঁর অসংখ্য চাকর-বাকর তাঁর ছাদের নীচে দিন দিন মোটা ও বড়ো হয়, নিজেদের খুশীমত যা ইচ্ছে তাই করে আর পাল্লা দিয়ে তাঁকে শোষণ করে। লিজাভেটা আইভ্যানোত্‌না সংসারের কর্তার মত। চা বানালে প্রত্যেক চিনির দলার জন্ত তাকে হিসাব দিতে হয়। জোরে জোরে বই পড়লে গ্রন্থকারের ক্রটীর জন্ত তাকে দায়ী হ'তে হয়। কাউন্টেস্‌এর সাথে বেড়াতে বেরোলে তাকে আবহাওয়া এবং রাস্তাঘাটের

বর্ণনা দিতে হয়। বাধা একটা মাইনে তার পাবার কথা, কিন্তু কোনদিনই সে তা পায়নি—অথচ অন্যান্য মেয়েদের মত তাকে পোষাক পরতে হবে, অর্থাৎ নির্ধারিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মত। সমাজে তার মর্যাদা অত্যন্ত দুঃসহ, সকলেই তাকে চেনে, অথচ কেউই তার দিকে এতটুকু দৃষ্টি দেয় না। ষষ্ঠে লোক না হ'লেই শুধু সে 'বলে' নাচে। পুনরায় অলপসামনে দরকার হ'লেই মেয়েরা ওর হাত ধরে 'ড্রেসিং রুম' নিয়ে যায়। খুব ভাবপ্রবণ সে। নিজের অবস্থা অনুভব করে সে নির্ধর্মভাবে—ব্যগ্রভাবে কোন মুক্তিদাতার সন্ধান করে। কিন্তু যে সমস্ত ছেলে তার চোখে পড়ে তাবা হিসেবী, নির্বোধ ও অহঙ্কারী, এবং ওকে মনোযোগ দেবার মত ব'লে ওরা মনে কবে না,—যদিও লিজাভেটা ওই নির্গঞ্জ মেয়েগুলো—যাদের চারদিকে ওই সমস্ত ছেলের দল ঘুরে বেড়ায়—ওদের চেয়ে শতগুণে সুন্দরী। কতবার সে ওই জমকালো এবং নিরানন্দ ড্রইং রুম থেকে পালিয়ে এসে কৈদেছে তাব নিজের সামান্য ঘরটাতে—যেখানে একটা পর্দা ঝুলছিলো এবং তাব মধ্যে ছিল একটা সিঁদুক, একখানা রঙীন খাট, একখানা বড় আয়না,—আর বাতিদানে মিট মিট ক'রে জলছিলো একটা মোমবাতি।

একদিন লিজাভেটা আইতানোভনা তার এম্ব্রয়ডারী নিয়ে জানলার ধারে বসেছিলো; এমন সময় সে রাস্তার দিকে তাকাতেই একজন তরুণ কাম্‌চারীকে অচেনাভাবে দাঁড়িয়ে তার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে। এটা ঘটে গেলের সূর্যতে যে-সন্ধ্যার উল্লেখ করা হয়েছে তার ছ'দিন পর, আর যে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হ'লো কেবলমাত্র তার সাত দিন আগে। মাথা নীচু করে সে কাজ করতে লেগে গেলো। পাঁচ মিনিট পর তাকিয়ে দেখল অফিসারটি সেই জায়গায়, ঠিক সেই স্থানটিতেই দাঁড়িয়ে আছে। যে সমস্ত অফিসার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তাদের দিকে

তাকানো ওর স্বভাব নয়, সেক্স, জানলা থেকে সরে এসে, মাথা না তুলে সে ছুঁকটা ধরে সেলাই করতে লাগলে। খাবার ঘণ্টা পড়লো। সে উঠে পড়ে সেলাইয়ের মিনিসপত্র তুলে রেখে দিলে। রাস্তায় হঠাৎ নজর পড়ায় সে অফিসারটিকে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে। ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ব'লে মনে হ'লো। খেয়ে আসার পর আবার শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে ওকে আর দেখতে পেল না। লীগ'জিরই সে ওর কথা তুলে গেলো। দু'দিন পরে কাউন্টেন্সের সাথে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে কিন্তু আবার ওকে দেখতে পেল। দরজার মুখের সিঁড়িটার পাশে সে দাঁড়িয়ে ছিলো—খুব জমকালো কলারে (জামার) তার মুখটা ঢাকা, আর টুপির নীচে তার কালো দু'টো চোখ জলছিলো। এক অজানা আশঙ্কায় আইভ্যানোভনা ভীত হ'য়ে পড়লো—অম্পট উত্তেজনায় গাড়ীতে গিয়ে বসলে।

বাড়ীতে ফিরেই সে জানলার কাছে ছুটে যায়—ঠিক সেই জায়গাটার সেই অফিসার দাঁড়িয়ে—চোখ দু'টো ওর মুখের দিকে স্থির হ'য়ে আছে। কৌতূহলে বিস্ময় হ'য়ে এবং এক অভিনবভাবে উত্তেজিত হ'য়ে সে জানলা থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলো।

তারপর থেকে এমন একদিনও যায় নি যেদিন সেই লোকটা ঠিক সময়ে সেই জানলার নীচে এসে না দাঁড়িয়েছে। একটা নিবৃত্ত সম্পর্ক ওদের মধ্যে গড়ে ওঠে। কাজ নিয়ে বসে থাকতে থাকতে সে তার আবির্ভাব অনুভব করতে পারতো এবং দৃষ্টি তুলে প্রত্যেক দিন আগের দিনের চেয়ে তার দিকে বেশীক্ষণ ধরে চাইতো। তার অনুগ্রহের জন্ত ছেলেটিকে যেন বেশ কৃতজ্ঞ বলে মনে হ'তো। যৌবনের তীব্র দৃষ্টি নিয়ে সে দেখতে পেতো যতবারই তাদের দৃষ্টি বিনিময় হ'ত, ততবারই ওর মুখের উপর একটা চকিত রক্তাভা ফুটে উঠছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সে ওর দিকে তাকিয়ে যুহু হাসতে আরম্ভ ক'রলে.....

টম্ভি যখন তার বন্ধুর সাথে আলাপ করিয়ে দেবার অচ্যুতি চায়, তখন হতভাগা মেয়েটির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে উঠেছিলো; কিন্তু নাকমত অজ্ঞারোহী সৈন্তদলে আছে জেনে, চল টম্ভির কাছে তার গুপ্ত কথা প্রকাশ করার জন্য তার অনুরোধনা হচ্ছিলো। হারম্যান একজন ক্ষণ-প্রবাসী আর্থ্যাণের ছেলে। সামান্য কিছু সম্পদ তিনি ওর অন্ত রেখে বান। স্বাধীন জীবনযাত্রার নিরাপত্তায় উষ্ম হ'য়ে হারম্যান তার মূলধনের হৃদয় উপর হাত দিতে না। নিজের মাইনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতো। কোনরকম বিলাসকে প্রত্যাখ্যান দিতে না। সে গম্ভীর এবং উচ্চাভিলাষী। সহকর্মীরা তার 'পবন হুঁসিয়ারী মনোবৃত্তির উপর কদাচিত্ হান্তপরিহাসের সুযোগ পেতো। সে কামুক বটে, কিন্তু তার উদ্দীপ্ত কল্পনাশক্তি ছিলো। কিন্তু তার চরিত্রবল তাকে যৌবনের স্বাভাবিক পদাঙ্কন থেকে রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, চরিত্রগত জুয়ারী হ'লেও সে কোনদিন তাস ছোঁয় নি এই ভেবে যে, ওটা সে পারে না। তার নিজের কথাতেই বলা যায়, “আমার নিজের অস্বা এমন নয় যে, দ্বিগুণ বিশ্বাসের আশায় আমি আমার প্রয়োজনকে বলি দিতে পারি।” সেই সমস্ত কারণে, সারারাত ধরে সে কার্ড টেবিলের সামনে বসে থেকে প্রবল কৌতূহলের সাথে খেলা লক্ষ্য করতো।

সেই তিনটি তাসের গল্প তার কল্পনাকে প্রথর করে তুললো। সারা রাত ধরে সে চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলো না। “আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক”, পরদিন সন্ধ্যায় সেন্টপিটার্সবার্গের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবলে, —“হী, ধরে নেওয়া যায়, যে, কাউন্টেন্ট যদি তার গুপ্ত কথা আমার কাছে প্রকাশ করেন? কেন আমি আমার ত্যাগ পরীক্ষা করবো না? তাঁকে জানতে হবে, তার অন্তগ্রহে উদ্দীপ্ত হ'তে হবে, প্রয়োজন হ'লে তাঁর প্রেমিকও সাজতে হবে। কিন্তু এসমস্ত ব্যাপারে সমস্ত লাগবে। আর বলস তার সাতাশি বছর, সপ্তাহ খানেকের ভেতর এমন কি একদিনেও

মায়াও তো যেতে পারেন। গল্পটা সত্য কিনা ভেবে আমার বিশ্বয় লাগছে। এটা উপকথাও তো হতে পারে। সাবধানতা, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম—এই তিনটে নিশ্চিত গুণই আমার মূলধনকে তিনগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এমন কি, সাতগুণও বাড়িয়ে শাস্তি এবং স্বাধীনতা আমার জন্য স্থাপতিষ্ঠিত করবে!”

এই ভাবে বিচার ক’রতে ক’রতে সে দেখলে যে সেন্টপিটার্সবার্গের একটা প্রধান রাস্তার একখানা চমৎকার পুরোনো দালানের সামনে সে দাঁড়িয়ে। রাস্তার দুধারে অসংখ্য গাড়ী টেউএর পর টেউ তুলে একটা বলমলে আলোকময় প্রকোষ্ঠের দিকে বিস্তৃত হ’য়ে গেছে। গাড়ী থেকে একজন সুন্দরী তরুণীর কৃষ্ণ-সুঠাম দুখানা পা’ বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো—পর পর উঁচু বুট, ট্রাইপ্ দেওয়া ‘টকিং’ এবং ‘ডিপ্লোম্যাটিক শ্’ দেখা গেলো। ফার কোট পরে টিলা জামার একটা বলক মিলিয়ে গেলো খানসামার পাশ দিয়ে।

—“কার বাড়ী এটা”? কোনের একজন পুলিশকে সে প্রশ্ন ক’রলে।

—“পুলিশম্যান্ উত্তর ক’রলে,—‘র কাউন্ট’”।

হারম্যান চমকে উঠলো। সেই অদ্ভুত গল্পটা তার মনকে আবার দখল ক’রে বসলে। গৃহস্বামিনী এবং তার অদ্ভুত শক্তির কথা ভাবতে ভাবতে সে পাগলি হতে লাগলে। অনেক রাতে সে তার কোয়ার্টারে ফিরে আসে। বহুক্ষণ ধরে তার ঘুম এলো না, কিন্তু অবশেষে ঘুম এলেও সে স্বপ্নে দেখলে, সে একখানা সবুজ টেবিলের পাশে ব’সে আছে—ওর উপর সুপীকৃত নোট এবং সোনা। তাসের পর তাস সে খেলে চ’লেছে, চুড়তার সাথে কোনগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছে, আর খালি তার জিত হচ্ছে, আর নোট এবং সোনা তার পকেটের মধ্যে বোঝাই ক’রে চ’লেছে। বহু দেরীতে তার ঘুম ভাঙে—সেই ছায়াময় ঐশ্বর্য্য হারানোতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে। আবার সে সন্ধ্যার বুক হাটতে থাকে এবং

দেখে যে, সেই কাউন্টসের বাড়ীর সামনেই ফের সে এসে উপস্থিত হয়েছে। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে বাড়ীটার দিকে টেনে নিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে জানালার মধ্য দিয়ে সে তাকাতো থাকে। ওর একটাতে তার চোখে পড়ে একটা কালো মাথা খুঁকে আছে—সম্ভবতঃ কোন বই অথবা কোন কাজের ওপর। মুখ তুলে সে চাইলে। একখানা মৃদর মুখ আর একজোড়া কালো চোখ ওব দৃষ্টিতে ফুটে উঠে। সেই মুহূর্তেই ওর ভাগ্য নির্ধারিত হ'য়ে যায়।

(৩)

লিজা সবেমাত্র তার পোষাক এবং টুপি খুলেছে, অমনি আবার কাউন্টসের তলব এসে যায় ওব কাছে—আবার গাড়ী ঠিক ক'রতে বলেন তিনি। তারা বাইরে বেরোয়। খানসামা দু'জন কাউন্টসকে নাজীতে উঠতে সাহায্য করার সময় লিজা সেই অফিসারটিকে চাকার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে ওর হাত ধরে। আতঙ্কে ও অভিভূত হ'য়ে পড়ে। একখানা চিঠি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে যুবকটি অদৃশ্য হ'য়ে যায়। চিঠিটা ওর দস্তানার ভেতর ও ঢুকিয়ে রাখে। সারটা পথ সে যেন স্বপ্নের মধ্যে মুহূমান হ'য়ে থাকে, তার কানে এবং চোখে কিছুই অল্পকৃত হয় না। গাড়ী চ'লতে থাকলে কাউন্টস তাঁর প্রকৃতিগত কৌতূহলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে ওকে বিহ্বল ক'রে তোলে।

“লোকটা কে?” তিনি জিজ্ঞাসা করেন। “এই ব্রীজটার নাম কি? সাইনবোর্ডে কি লেখা আছে?”

লিজা চিন্তা না ক'রে অগ্রমনস্কভাবে উত্তর দেয়, তার উত্তরটা প্রায়ই অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

কাউন্টেন্স রেগে ওঠেন —“তোয়ার হ'লো কি লিজা? তোমাকে আজ কাঠের পুতুলের মত দেখাচ্ছে! তুমি কি গুনতে পাচ্ছো না, অথবা বুঝতে পারছো না? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখনও পরিকারভাবে এবং প্রসঙ্গমতই কথা ব'লতে পারি।”

লিজা ঠুর কথা গুনতে পায় না। বাড়ীতে পৌছেই ও নিজের ঘরে গিয়ে দস্তানা থেকে চিঠিটা বের ক'রে ফেলে। ‘সিল’ করা নয় চিঠিটা প'ড়তে আরম্ভ করে সে। জার্মান নভেল থেকে হবছ নকল ক'রে ওতে শাস্ত এবং সন্ত্রমপূর্ণ প্রেম নিবেদন করা হ'য়েছিলো। লিজা জার্মান ভাষা জানতো না, তাই সম্বৃত্ত হ'য়েছিলো সে। তা'সত্ত্বেও চিঠিটা ওকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ক'রে তুললে। প্রথমতঃ সে একজন যুবকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় চিঠিপত্র আদানপ্রদান ক'রছে। তার সাহসে তার আতঙ্ক উপস্থিত হ'লো। অসংযত চরিত্রের জন্য নিজেকে দিকার দিলো। কি ক'রবে সে ভেবে পেলে না। সে কি জানলার খাঞ্চে ব'সে কাজ করা ছেড়ে দেবে, এবং তার ঔদাসীনা দেখিয়ে যুবকের উৎসাহ ভেঙ্গে দেবে? চিঠিটা কি সে ফিরিয়ে দেবে, অথবা বিরক্তি এবং কঠোরতার সাথে জবাব দেবে? এমন কেউ নেই, যার উপদেশ নেওয়া চলে। তার কোন বান্ধবী অথবা কোন শিক্ষয়িত্রীও নেই। লিজা উত্তর দেবে ব'লেই ঠিক ক'রলে।

তার ছোট রাইটিং টেবিলটার সামনে ব'সে কলম এবং কাগজ নিয়ে সে লিখতে চেষ্টা করে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সে লিখতে থাকে। একটার পর একটা ছেঁড়ে, কারণ, কোনটার স্বরে অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়ার ভাব, আবার কোনটার ভাবা অত্যন্ত রুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত সে কমবেশি সম্ভোষজনক কয়েকটা লাইন লিখতে সমর্থ হ'লো। লিখলে সে, “আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনার উদ্দেশ্য খুব মহৎ এবং আপনার অবিস্মৃতিকারিতার দ্বারা আমাকে অপমান ক'রতে চান নি। কিন্তু আমাদের পরিচয়

এভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিলো না। আমি এই আশা করে আপনার চিঠি ফিরিয়ে দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আপনার অমর্যাদার সবকিছু আমার অভিযোগ জানানোর কোন কারণ থাকবে না, এবং যেটা আমার কাছে সত্যই সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

পরদিন হারম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে লিজা তার ‘এমব্রয়ডারি’ খুঁয়ে উঠে পড়ে। ড্রইং রুমে গিয়ে জানলা গলিয়ে সে চিঠিটা কেলে দেয় যুবকটির ক্ষিপ্ততার উপর নির্ভর করে। হারম্যান ছুটে গিয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে পড়ে। পাম ছিঁড়ে তার নিজের চিঠিটা এবং লিজার উত্তর দেখতে পায়। ঠিক ওই রকম উত্তরই সে আশা করেছিলো। মতলব আঁটতে আঁটতে বাড়ী ফেরে সে।

তিন দিন পর একটা পরিচ্ছদের দোকান থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিওয়ালা একটা মেয়ে লিজার নামে একখানা চিঠি নিয়ে আসে। কোন ‘বিল্’ হবে মনে করে চিঠিটা খুলে হঠাৎ সে হারম্যানের হাতের লেখাটা চিনে ফেলে।

সে বলে, “তুমি ভুল করেছো ভাই, ঐ চিঠিটা আমার নয়।”

—“হাঁ, এটা তোমারই”, সেই নির্লজ্জ মেয়েটি তার দুই হাসিটুকু না লুকিয়ে উত্তর দেয়। “তুমি কি ভাই দয়া করে চিঠিটা পড়বে?”

লিজা চিঠিটা দেখতে থাকে। হারম্যান দেখা করতে চায়।

—“অসম্ভব”, সে বলে—ওর ইচ্ছার আকস্মিকতায় এবং উপায়ের রীতিতে সে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। “এটা নিশ্চয়ই আমাকে লেখা হয় নি” বলেই সে চিঠিটা শত টুকরা করে ফেলে।

—“তোমার না হ’লে তুমি ছিঁড়লে কেন?” মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, “চিঠিটা যে দিয়েছিলো তাকে ফিরিয়ে দিতাম।”

মেয়েটির প্লেষে লিজা কেটে পড়ে বললে, “দেখ ভাই, ভবিষ্যতে আর কোন দিন আমার জন্ত কোন চিঠি নিয়ে এসো না বলছি, আর যিনি চিঠিটা দিয়েছেন তাঁকে ব’লো, যে তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত।”

কিন্তু হারম্যানকে প্রতিনিবৃত্ত করানো গেলো না। কোন না কোন উপায়ে নিজার কাছে রোজই তার একখানা ক'রে চিঠি এসে পৌছয়। সেগুলো আর জার্খাণ ভাষার অশুবাদ নয়। হারম্যান নিজেই সেগুলো লিখতো। অসুস্থরাগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে তার নিজস্ব একরকম ভাষায় ওসব লিখতো—তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা এবং অসংযত কল্পনার এলোমেলো ভাব ওর মধ্যে ছুটে উঠতো। নিজাভেটা আইভানোভনা ওগুলোকে আর ফিরিয়ে দেবার কল্পনা করতো না। ওতে সে আনন্দই পেতো প্রচুর, আর তার উত্তরগুলোও দিন দিন বেশ প্রাণম্পর্শী হয়ে ওঠে। শেষে সে এই চিঠিটা জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়, “আজ রাতে রাজদূতের বাড়ীতে ‘বল্’ নাচ আছে। কাউন্টেন্ সেশানে যাবেন। আমরা দুটো অবধি থাকব। নির্জনে আমার সঙ্গে দেখা করার একটা সুযোগ আমি তোমাকে দিচ্ছি।”—তারপরে কি ক'বে তার ঘরে যেতে হবে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হারম্যান বাঘের মত চঞ্চলভাবে পায়েচাঁরি করতে থাকে। দণটার সময়ই সে কাউন্টেন্সের বাড়ীতে পৌঁছে গেছে। আবহাওয়া ভরস্কর। বাতাস গর্জন করে চলেছে। চাকা চাকা নরম ভিজে বরফ পড়ছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে মিট মিট ক'রে। পথ জনশূন্য। মাঝে মাঝে ‘গ্রেজ’ চালকেরা তাদের শোচনীয় গাড়ীগুলো নিয়ে ছুটছিলো—বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছিলো তখনও কোন ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। হারম্যান সেই ঝড় এবং তুষারঝড়িকে উপেক্ষা ক'রে শুধু একটা কোট গায়ে দাঁড়িয়েছিলো। অবশেষে, কাউন্টেন্সের গাড়ী যেতে দেখা গেলো। সে দুজন আদালীকে কালো পোষাক পরা কাউন্টেন্সকে হাত ধরে গাড়ীতে উঠাতে দেখলে। পিছনে একটা ডিলে জামা পরা এবং মাথায় টাটকা ফুল গোঁজা তারই সঙ্গী। গাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল। নরম বরফের উপর দিয়ে গাড়ীর চাকা গড়িয়ে চলছে। একজন লোক বাড়ীর

দরজা বন্ধ করে দিলে। জানালার আলোগুলো নিতে যায়। নির্জন বাড়ীটার সামনে হারম্যান পাথচারি করতে থাকে। ঘড়িতে ক'টা বেজেছে দেখবার জন্য রাস্তার আলোর কাছে সে যায়। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। আলোটার কাছেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো তার হাতের ওপর, মিনিটের কাঁটাটা ঘুরবার জন্য সে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করে। সাড়ে এগাবোটা বাজলে কাউন্টেসের দরজার সামনে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে সে ওঠে এবং আলোকোজ্জ্বল হলটায় ঢোকে। সেখানে কেউই ছিল না। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে উঠতে থাকে এবং শেষ প্রান্তে গিয়ে একজন ভৃত্যকে পুরাণো একটা 'আর্থ চেয়ার' শুয়ে থাকতে দেখে। মুহূর্ঘ্যে পদক্ষেপে হারম্যান তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। 'বলকম' ও 'ড্রইংরুম' দুটো অন্ধকারে ভরা—সিঁড়ির শেষপ্রান্তের ছোট বাতিটা থেকে শুধু মিটমিট করে একটু আলো আসছিলো। হারম্যান কাউন্টেসের শয়নকক্ষে ঢোকে। প্রাচীন মুক্তি-খচিত একটা বেদীর সামনে একটা সোনার 'আইকন' আলো জ্বলছিলো। পিঙ্গল ঝালরে ঢাকা আর্থ চেয়ার এবং গদীবিশিষ্ট কোচ, স্বর্ণখচিত আসন—দেওয়ালের গায়ে স্থূঁভাবে সারি সারি সাজানো। দেওয়ালটা চাইনিজ ওয়াল পেপারে ছাওয়া। ম্যাভাম লেব্রার প্যারিশে আঁকা দুখানা ছবি দেওয়ালে টাঙানো। একটাতে চল্লিশ বছরের একজন লোক—বলিষ্ট, বরুণ গণ্ড, সবুজ ইউনিফর্মে 'ষ্টার' গাঁথা। আর একজন হচ্ছে সুন্দরী তরুণী—বঁাকা নাক, মাথার উপর শস্ত করে বাঁধা পাউডার মাখানো চুলে গোলাপ ফুল গৌজা। চারিদিকে নানারকম সুন্দর সমস্ত জিনিস। হারম্যান পদার ভেতর ঢুকলে। সামনে তার ছোট্ট একখানা লোহার খাট—ডানদিকে 'ষ্টাভি' কমে যাবার একটা দরজা। বায়ে বাড়ানায় যাওয়ার আর একটা দরজা। হারম্যান সেটা খুলে দেখলে একটা অপ্রশস্ত বাকানো সিঁড়ি লিফটার ঘর পর্যন্ত চ'লে গেছে। সে ফিরে এনে ষ্টাভি কমে ঢুকলে।

আন্তে আন্তে সময় এগিয়ে চলছিলো। সমস্ত নিষ্কুম। ড্রইং রুমের ঘড়িটার বারোটা বাজে। অত্যাশ্চর্যের ঘড়িগুলোও একে একে বেজে আবার সব নীরব হয়ে যায়। হারম্যান ঠাণ্ডা ঠোঁটটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শাস্ত ছিলো সে। তার জ্বংগিণ্ডের গতি ঠিক সেই রকমই ছিলো, বিপজ্জনক অথচ অপ্ৰয়োজনীয় কোন কাজ করতে গেলে যেমন হয়। ঘড়িতে একটা-দুটো বেজে গেলো। দূরবর্তী একখানা গাড়ীর শব্দ শুনতে পেলে সে। একটা স্বতঃপ্রসূত উদ্বেজনা তাকে পেয়ে বসে। গাড়ীটা দরজার গোড়ায় আসে। সে শুনতে পেলে, কেমন করে বরফের উপর দিয়ে গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হ'লো। বাড়ীতে একটা ছড়োছড়ি পড়ে গেলো। চাকরগুলো ছুটে খাকে। অনেক গলার আওয়াজ শোনা যায়। আলোগুলো জলে ওঠে। তিনজন পরিচারিকা কাউন্টেন্টকে ধরে নিয়ে এসে শোবার ঘরে ঢোকে। কাউন্টেন্ট অর্ধমৃত অবস্থায় চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে হারম্যান দেখে। লিজা তার পাশ দিয়েই চ'লে যায়। সিঁড়িতে ওর চঞ্চল পায়ের শব্দ শোনা যায়। একটু অসুস্থ ব্যথা তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে, কিন্তু খেয়াল করে না। হঠাৎ সে পাথরের মত জমে যায়।

আয়নার সামনে কাউন্টেন্ট তাঁর পোষাক খুলতে থাকেন। পরিচারিকা তাঁর গোলাপ-শোভিত টুপিটা খুলে ফেলে। তারপর, তাঁর পাউডার মাখানো পরচুলটা খসিয়ে নিলে, তাঁর ছোট ক'রে কাটা পাকা চুল বেরিয়ে পড়ে। পিনগুলো চারিদিকে ঝরে পড়ে। রৌপ্যখচিত হলুদ রংএর পাউনটা ফোলা পায়ের ওপর খুলে পড়ে। হারম্যান তাঁর বিরক্তিকর অজপ্রসাধনীরাশি চেয়ে চেয়ে দেখে। অবশেষে কাউন্টেন্ট হাল্কা একটা জ্যাকেট এবং একটা 'নাইট ক্যাপ' পরে। তাঁর বয়সের উপযুক্ত এই বেশে তাঁকে ক'ম ভয়াবহ এবং বীভৎস দেখায়। প্রায় বড়ো লোকের মতই তিনি অনিগ্রায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। পরিচারিকাদের বিদায় দিয়ে

তিনি একখানা ‘আর্শচেয়ারে’ বসেন। বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়। সেই ‘আইকন্ ল্যাম্প’এর আলোই শুধু ঘরটাকে একটু উজ্জ্বল করে রেখেছিল। রোগ-পাণ্ডুর কাউন্টেন্স তার স্নায়ুহীন ঠোঁট কামড়াচ্ছিলেন—আর ছল-ছিলেন এদিক ওদিক। তাঁর নিস্ত্র ভাখ ছোটো সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে ব্যক্ত হচ্ছিল। তাঁর দিকে তাকিয়ে গলে হয় তাঁর ওই দোলা স্বতঃপ্রসূত, এবং ওতে তাঁর নিঃস্বের কোন ইচ্ছার স্থান ছিল না।

হঠাৎ তাঁর উদাসীন মুখের উপর একটা অব্যক্ত পরিবর্তন খেলে যায়। তাঁর ঠোঁট দুটো নিখর হয়ে যায়, চোখে বিহবলতা ফুটে উঠে—একজন অচেনা লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

—“ভয় পাবেন না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ভয় পাবেন না”—শাস্ত্র-হৃদয়গ্রাহী স্বরে সে বলে। “আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমি একটা অল্পগ্রহ প্রার্থনা করতে এসেছি মাত্র।”

তিনি নীরবে প্রশান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকেন—মনে হয়, স্তন্যপান নি তিনি, বধির ভেবে হারমান বুকে পড়ে একেবারে তাঁর কাণের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে সেই কথাগুলো বলে। তবুও কাউন্টেন্স নির্বাক্।

“আপনি আমার ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন”, হারমান বলে থাকে। “আপনি আপনার কোন ক্ষতি না করে আমাকে সুখী করতে পারেন। আমি জানি যে আপনি সেই তিনটি তাসের নাম জানেন।”

হারমান খেমে যায়। মনে হ’লো কাউন্টেন্স তার কথা বুঝেছেন, এবং উত্তর দেবার কথাগুলো গুছাতে চেষ্টা করছেন।

“সেটা একটা তামাসা”। অবশেষে তিনি বললেন, “আমি নিশ্চয় করে বলছি, সেটা একটা তামাসা”।

—“না, এটা একটুও তামাসা নয়”, হারমান রুটভাবে প্রত্যুত্তর দেয়।

“আপনি কি চাপ্লিনস্কির কথা ভুলে গেছেন—যাকে আপনি তার ক্ষতি পুরিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন ?

কাউন্টেন্স স্পষ্টতঃ অবাক হয়ে যান। তার মুখশ্রী প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে। কিন্তু শীগ্গিরই তিনি আবার আনমনা হয়ে পড়েন।

—“আমাকে কি ব’লতে পারেন সেই তিনটি তাস কি ?” হারম্যান জানতে চাইলে।

কাউন্টেন্স নির্ঝাঁক। হারম্যান ব’লে চলে :

“কার জন্ত আপনি ওই গুপ্ত কথাটা আগলিয়ে র’য়েছেন ? নাত্তিদের জন্ত নাকি ? তারা ত যথেষ্ট ধনী। টাকার মূল্য তারা বোঝে না। আপনার তাস অপব্যয়ীকে সাহায্য ক’রবে না। বাপের টাকা যে উড়িয়ে দেয় সে দারিদ্র্যের মধ্যে ম’রবেই—ম্যাজিকে তার কোন ফল হবে না। আমি অপব্যয়ী নই। টাকার মূল্য আমি বুঝি। আপনার তাস আমার কাছে অপচয়ের মধ্যে প’ড়বে না। হ্যাঁ ?

সে থামলে এবং উত্তরের জন্ত ক্রুদ্ধভাবে অপেক্ষা ক’রলে। কাউন্টেন্স নীরব। হারম্যান হাঁটু গেড়ে ব’লতে লাগলে—

“যদি কোনদিন ভালবেসে থাকেন,” সে অহরোধ ক’রলে, “যদি আপনার বিজয়ের কথা স্মরণ হয়, নবজাত শিশুর চিৎকার শুনে কখনও যদি হেসে থাকেন, মাগুষের কোন ভাব যদি আপনার অন্তর স্পর্শ ক’রে থাকে, তাহ’লে আমি তাদের সবার নামে প্রার্থনা জানাচ্ছি—

“জ্ঞা হিসেবে, কজ্ঞা হিসেবে, যা হিসেবে, অর্থাৎ জীবনের সব কিছু পবিত্রতার নামে আমি প্রার্থনা ক’রছি, আমার অহরোধ উপেক্ষা ক’রবেন না। আপনার গুপ্ত কথাটি আমার কাছে প্রকাশ করুন।

“..... হয়তো কোন ভীষণ পাপের সাথে এটা জড়িত, মুক্তি হয়তো হারাতে হবে আপনাকে এর জন্ত, হয়তো শয়তানের সাথে আপনি কোন চুক্তি ক’রে থাকবেন মনে করুন, আপনি বুড়ো হ’য়ে গেছেন, আর

বেশীদিন বাঁচবেন না—আপনার পাশ আমি আমার বাড়ি নোব,—শুধু আপনার গুপ্ত কথাটি বলুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, যে আপনার হাতে একজনের সুখ শাস্তি নির্ভর করছে? শুধু আমি নয়, আমার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র সকলেই আপনার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ জানাবে এবং আপনার স্মৃতিকে পবিত্র বলে মনে করবে”

একটা কথাও কাউন্টসের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

হারম্যান্ উঠে দাঁড়ায়।

—“বুড়ি ডাইনী!”—দাঁতে দাঁত কিড়মিড় কর’তে কর’তে সে বলে, “দাঁড়াও, তোমাকে বলতে আমি বাধ্য করছি!”

এই কথা বলে সে পকেট থেকে রিভলভার বের করে।

রিভলভার দেখে এই আর একবার কাউন্টস্ আবেগ ব্যক্ত করেন। মাথাটা পিছনে টেনে নিয়ে তিনি হাত তুলে আড়াল করেন, তারপর প’ড়ে যান অচৈতন্য হ’য়ে।

“তোমার শিশুস্বলভ খেলা থামাও,” তার হাত ধ’রে হারম্যান্ বলে। “শেষবারের মত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি বলবে, কি বলবে না—বল, সেই তাস তিনটির কথা!”

কাউন্টসের উত্তর পাওয়া যায় না। হারম্যান্ দেখলে তিনি মারা গেছেন।

(৪)

লিজা বলের পোষাকেই ব’সে ছিলো তার ঘরে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে। বাড়ীতে ফিরে সে তার তজ্জাচ্ছন্ন পরিচারিকাকে বিদায় করে দেয়—পরিচারিকাটা নেহাৎ অনিচ্ছার সাথে কাজ কর’ছিলো। লিজা বলে, সে তার সাহায্য ছাড়াই পোষাক খুলতে পারবে। হারম্যান্কে দেখবে আশায় সে ঘরে

ছুটে যায়—আবার মনে হচ্ছিলো সে হয়ত সেখানে নেই। এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়েই সে তার অস্থপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'লে। তার ভাগ্যকে সে খজ্ঞাবাদ দেয় যে সেই দুর্ঘটনাটার জন্ত তাদের দেখা হয় নি। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সে সেই ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করে—যা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘ'টে গেছে, এবং যা তাকে এতদূর টেনে নিয়ে এসেছে। সেই জানালা থেকে তাকে প্রথম দেখার পর তিন সপ্তাহ গেছে কিনা সন্দেহ, এরই মধ্যে তারা পরস্পরকে চিঠি লিখতে আরম্ভ ক'রেছে, এবং তার সাথে ওকে নৈশ সাক্ষাৎকারেও রাজী করিয়েছে। তার চিঠির স্বাক্ষর থেকেই শুধু সে ওর নামের সাথে পরিচিত হ'য়েছে। একবারও তার সাথে কথা বলা হয় নি; তার গলার স্বরও কোনদিন শোনে নি; আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও কাউকেই ওর নাম ব'লেতে শুনে নি। কি অদ্ভুত ঘটনা! সেইদিনই সন্ধ্যায় 'বলে' প্রিন্সেস পলিনা অল্প লোকের সাথে ঠাট্টা-তামাসা ক'রছিলো ব'লে, বিরজি দেখাবার জন্যই টম্‌স্কি লিঙ্গার সাথে অফুরন্ত নাচ নেচেছিলো। নাচতে নাচতে সে এঞ্জিনিয়ারদের উপর পুরুপাতিত্ব দেখাবার জন্য ওকে বিদ্রূপ করেছিলো, এবং তাকে ভরসা দিয়েছিলো যে, সে যা সন্দেহ করে তার চেয়ে বেশী সে জানে। তার কতকগুলো রহস্য এমন সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছিলো যে, লিঙ্গার দু' একবার মনে হ'য়েছিলো সে তার গুপ্তকথা নিশ্চয়ই জানে।

হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো,—“কে ব'লেছে ওসব?”

“তুমি যা'কে চেনো তারই একজন বন্ধু,” টম্‌স্কি উত্তর করে। “খুব আশ্চর্য্য লোকটা!”

—“এই আশ্চর্য্য লোকটা কে?”

—“নাম তার হারম্যান।”

লিঙ্গা উত্তর করে নি—হাত পা তার ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিলো।

—“হারম্যান,” টম্‌স্কি ব’লতে থাকে, “হ্যাঁ হারম্যান্ সত্যিই একজন অদ্ভুত লোক। নেপোলিয়ানের মত দেখতে। মেফিস্টোফেলিস্ এর মত তার আত্মা। অস্তুতঃ তিনটে অপরাধ তার মনের মধ্যে জন্মে থাকে। কি ক্যাকাসে হ’য়ে গেছে তোমার মুখটা!”

“মাথা ধ’রেছে আমার হারম্যান্ কি কিংবা যাই হোক তার নাম তোমাকে ব’লেছিলো?”

“হারম্যান্ তার বন্ধুর ওপর একটুও সন্দেহ নয়। সে বলে যে, তার পরিবর্তে সে অস্ত্র রকম ব্যবহার ক’রতো। মনে হয়, তোমার সম্বন্ধে তার একটা মতলব আছে। তাব প্রেম-জর্জরিত বন্ধুদের গোপনীয় কথাবার্তা সে পরম উদাসীনভাবে শোনে।

—“কিন্তু আমাকে সে কোথায় দেখেছে?”

—“ভগবান জানেন—চার্চে হ’তে পারে, রাস্তায়ও সম্ভব। হয়তো তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে তখন তোমার ঘরেও হ’তে পারে।

তিনজন মহিলা আসাতে তাদের কথাবার্তা থেমে যায়। কথাবার্তাটা লিজাব কাছে দুঃসহভাবে কৌতূহলজনক হ’য়ে উঠেছিলো। তাদের একজন হচ্ছে প্রিন্স পলিমা স্বয়ং। সে টম্‌স্কিকে তাব কথাগুলো পরিকার ক’রে ব’লতে পেরেছিলো এবং ফিরে আসার পর লিজা অথবা হারম্যান্ সম্বন্ধে সে আর ভাবছিলো না। সে আবার সেই কথাবার্তা আরম্ভ ক’রতে চেয়েছিলো, কিন্তু নাচ শেষ হওয়ায় শীগগিরই কাউন্টেন্স বিদায় নিয়ে নেন।

টম্‌স্কির কথাগুলো হয়তো ‘বল’ ক্রমের খোসগল ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু স্বপ্নাচ্ছয়া তরুণীর অস্তুর তা’ গভীর ভাবে স্পর্শ ক’রেছিলো।

টম্‌স্কির কথায় যে মুক্তি ফুটে উঠেছিলো, নিজের কল্পনার সাথে তার মিল আছে। নিতান্ত সাধারণ মুখ তা’কে আতঙ্কিত করলে। হাত ছ’পানা আড়াআড়ি রেখে, নগ্নবকের ওপর মাথাটা ঝুঁকে সে ব’লে রইলো—

মাথায় তখনও ফুল গোঁজা। হঠাৎ দরজা খুলে হারম্যান প্রবেশ করলে।
চমকে ওঠে ও—

—“তুমি কোথায় ছিলে!” শক্তিতভাবে ফিস্ ফিস্ করে সে জিজ্ঞাসা করে।

“কাউন্টেসের শোবার ঘরে”—হারম্যান উত্তর দেয়। “আমি সেইখান থেকেই আসছি। কাউন্টেস্ মারা গেছেন।”

—“মারা গেছেন, হা ভগবান, তুমি বলছো কি?”

—“আর, মনে হয়, আমিই মৃত্যুর কারণ,” হারম্যান বলে।

লিজাবেটা আইভানোভনা ওর দিকে তাকায়। টমস্কির কথাটা ওর অন্তরে আঘাত দিয়েছিলো, “ওর বিবেকে অন্ততঃ তিন তিনটে অপরাধ জমে আছে।”

হারম্যান ওর পাশে বসে সমস্ত বলে।

আতঙ্কিতভাবে সে ওর কথা শোনে। তাহলে ওর সমস্ত আবেগভরা চিঠি, ওর ব্যগ্র অম্মনয়, তার উদ্ধত নিষ্ঠুর নির্ধ্যাতন...আদৌ প্রেম নেই এসবের পেছনে? টাকার জন্তই তার আত্মার ভ্রমণ। সে তার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারতো না, অথবা তাকে স্থবী করতেও সক্ষম হোতনা; সে একজন দস্যুর অন্ধ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয়নি—যে দস্যু তার মজলাকাজিনীর হস্তা! লিজার চোখ দিয়ে তিক্ত এবং করুণ অশ্রু করে পড়তে লাগলো।

হারম্যান নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তার অন্তরও মথিত হয়ে যাচ্ছিলো—হতভাগা মেয়েটার চোখের জলের জন্তই নয়—ওর দুঃখে ও একটুও ব্যথিত হয়নি। বুড়ো মেয়েলোকটার মৃত্যুর জন্ত তার একটুও দয়া হচ্ছিলো না—যে জিনিসটা তাকে শক্তিত করেছিলো—সেটা হচ্ছে, যে গুপ্ত কথাটার সাহায্যে সে ঐশ্বর্য আশী করেছিলো, তার সম্পূর্ণ লোকসানের জন্ত।

লিজা অবশেষে বলে, “কি ভীষণ প্রকৃতির লোক তুমি!”

হারম্যান্ উত্তর করে, “আমি ওঁর মৃত্যু কামনা করি নি। আমার রিভলবারে গুলি ছিলো না।”

দুজনেই নীরব।

ভোর হয়। লিজা মির্টমিটে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। জানলার ভেতর দিয়ে স্নান আলো ঘরটার মধ্যে ঢুকেছিলো। অশ্রুসিক্ত চোখ দুটো মুছে সে হারম্যানের দিকে তুলে ধরে। হাতদুটো একত্র ক’রে সে জানলার ওপর বসে ছিলো—মুখের ওপর তার গভীর একটা ক্রবুটি। এই অবস্থায় তাকে ঠিক নেপোলিয়নের মূর্তির মত দেখায়। লিজা ওটা না দেখে থাকতে পারে না।

—“কেমন করে তুমি এই বাড়ী থেকে বেরোবে?” অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করে। “একটা গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কাউন্টেসের শয়নকক্ষের পাশ দিয়ে যেতে আমি সাহস পাই না।”

—“সিঁড়িটা কোথায় বল, আমি পথ দেখে নেব।”

লিজা উঠে ড্রয়ার থেকে একটা চাবি নিয়ে হারম্যানকে দিয়ে সিঁড়িতে যাবার পথটার কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আবার কাউন্টেসের শয়নকক্ষে ঢোকে। কাউন্টেস্ তখন শক্ত ও সোজাভাবে চেয়ারে বসেছিলেন—মুখটা তাঁর একেবারে প্রশান্ত। ওঁকে দেখবার জন্তে হারম্যান্ একবার থামে—যেন ওই ভয়ঙ্কর সত্য সম্বন্ধে নিজকে বোঝাতে চাচ্ছিলো। অবশেষে সে দরজার কাছে হাতড়াতে হাতড়াতে ‘ষ্টাডি রুম’ ঢোকে এবং অদ্ভুত চিন্তা ও ভাবকে আচ্ছন্ন হ’য়ে সে অন্ধকার একটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। ভাবে সে—“ষাট বছর আগে ঠিক এই সিঁড়ি দিয়েই হয়তো কোন স্থবী প্রেমিক ওই ঘর থেকে ঠিক এই সময়েই গোপনে পালিয়ে গেছে। সেই প্রেমিক নিঃসন্দেহে সুন্দর—মূল্যবান এমনকি জারি করা জামা-পড়া, চুল সুন্দর ক’রে

হাঁটা, তিন কোণা টুপিটা তার বুকের ওপর চাপা। আর এখন তার হাড়গুলো কবরে জীর্ণ হয়ে চলেছে, আর তার বৃদ্ধা প্রণয়িণীর হৃৎপিণ্ডের গতি শুক হয়ে গেছে।”

(৫)

সেই ভীষণ রাতের তিন দিনের দিন সকাল ন’টায় হারম্যান যেখানে কাউন্টসের অস্ব্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবার কথা সেই মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যদিও ওই ঘটনাতে দুঃখ তাব একটুও হয়নি, তবুও বিবেকের কর্তৃকে সে চেপে রাখতে পারে নি। বিবেক তার বলছিলো, “তুমিই বুড়ো মেয়েলোকটিকে হত্যা করেছো!” বিশ্বাস তার অল্প থাকলেও সে কুসংস্কারী ছিলো। আর মৃত্যু কাউন্টস তার জীবনের ওপর অসং উপসর্গের মত লেগে থাকতে পারে এই ভয়ে সে তাঁর শেষ ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে বলে ঠিক করেছিলো।

চার্লস লোকে লোকারণ্য। বহু কষ্টে ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নেয় হারম্যান। একটা জমকালো শবাধারের ওপর কফিনটা রাখা হয়েছে—ওপরে ভেলভেটের চক্ৰাতপ। মৃত্যুকে একটা সাদা সাটিনের গাউন পড়ানো হয়েছে—মাথায় জ্বরির কাজ করা টুপি। হাতজুটে বুকের ওপর আভাষাড়ি করে বসানো। তাঁকে ঘিরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর। চাকরদের পরনে কালো পোষাক, হাতে মোমবাতি। আত্মীয়-স্বজন—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সবাই গভীর শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু কেউই এক ফোটা চোখের জল ফেলছে না—কারণ তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ কারও হয়নি। কাউন্টস খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন; আর তাঁর পরিজনবর্গ মনে করতো উনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশীদিন বেঁচেছেন। একজন তরুণ পুরুত সমাধি অস্থলানের মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। সরল

এবং মর্মস্পর্শী বাক্যে তিনি এই সাধবী স্ত্রীলোকটির শাস্তিপূর্ণ মৃত্যুর কথা বর্ণনা করলেন। বলছিলেন তিনি, যে তাঁর সারা জীবনটাই খ্রীষ্টীয় আদর্শের জন্ত অর্গবিত প্রস্তুতি। বক্তা শেষ ক'রলেন এই বলে যে, “মৃত্যুর দূত তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন নৈশ বরের জন্ত শুভ জাগরণ।” গম্ভীর অমৃতাণের মধ্যে কাজ শেষ করা হয়। আত্মীয়েরাই সর্বপ্রথম মৃতদেহকে বিদায় সম্বন্ধনা জানান। তারপর আসেন অসংখ্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল, যারা সামাজিক উৎসবের আবর্তেব মধ্যে তাঁকে অভিবাদন জানাতেন। তাঁদের পরে দাস-দাসীরা আসে—তাদের মধ্যে সেই হু'জন মেয়েও ছিলো, যারা বাডীতে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর সময় কাউন্টেন্টে সাহায্য ক'রতো। একজনের শুয়ে পড়ে বিদায় সম্বন্ধনা জানাবার শক্তি ছিলো না, অল্পজন তার কতীর হাতে একটা চুমো খেতে খেতে হু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে। সেই সময় হারম্যান ‘কফিনের’ কাছে যাবে স্থির ক'রলে। পাইন গাছের ডাল-পালা-ছড়ানো ঠাণ্ডা মেজের ওপর কয়েক মিনিটের জন্ত সটান শুয়ে পড়ে শেষে সে ওঠে। স্ত্রীলোকটির মত তার মুখখানাও ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় এবং কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে শব্দধারের ওপর ঝুঁকে পড়ে। মনে হচ্ছিলো তার, যেন কাউন্টেন্ট তার দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি ইসারা ক'রছেন। হারম্যান তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসে এবং মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে লিজাকেও অচেতন অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। গম্ভীর এবং শোকাব্বক কাজে এতে একটু বিঘ্ন ঘটে। জনতার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। মৃত্যুর আত্মীয় একজন ক্লশ গোছের রাজকর্মচারী পার্শ্বস্থিত একজন ইংরাজকে বলেন যে, “তরুণ কর্মচারীটি হচ্ছেন কাউন্টেন্টের জারজ পুত্র।” তাতে ইংরাজ ভদ্রলোক স্থিরভাবে উত্তর দেন “অবশ্যই!”

সারাটা দিন হারম্যান উন্নতভাবে ঘুরে বেড়ায়। একটা নিরালস্য

সরাইখানায় গিয়ে সে খায়। অন্তরের বিশৃঙ্খলা ভুলে যাবার আশায় সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধে অনেকটা মদ পান করে। কিন্তু মদ ওর কল্পনাকে ত্রুততর করে শুধু। বাড়ীতে ফিরে পোষাক না খুলেই সে বিছানায় ঢ'লে পড়ে এবং গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।

রাতে সে জাগে। জানালার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো আসে। ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখে তিনটে বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। বিছানায় উঠে ব'সে কাউন্টসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা ভাবে। এই সময়ে কে যেন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে যায়। হারম্যান ওতে নজর দেয় না। মিনিট খানেকের ভেতর যেন কেউ বাইরের ঘরের দরজা খোলে। হারম্যান মনে করে, ও হয়তো তার আদালি, যে অভ্যাসমত নৈশ যত্নপ্রতিযোগিতায় অসম্ভব মদ টেনে বাড়ী ফিরেছে। কিন্তু একটা অপরিচিত পদক্ষেপ তার কানে ভেসে আসে। মুহূ বেভাঁজ চাল। দরজা খুলে যায়—একটা সাদা পোষাক-পরা স্ত্রীলোক ঘরে ঢোকে। হারম্যান ভাবে, ও তার নার্স; কিন্তু এত রাতে নার্স কি জন্ত এসেছে? মেঝের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়ে আসে এবং তার সামনে দাঁড়ায়। হারম্যান কাউন্টসকে চিনতে পারে।

“আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমার কাছে আসতে হ'য়েছে”—অকম্পিত স্বরে সে বলে। “তোমার অনুরোধকে পূর্ণ করবার জন্ত আমাকে আদেশ করা হ'য়েছে। তিন, সাত এবং টেক্স এই তিনটেই হচ্ছে জিতের তাগ। কিন্তু একবারে এক বাজি ছাড়া এবং জীবনে আর কোনদিন খেলতে পারবে না তুমি।.....লিজাকে বিয়ে ক'রলে আমি আমার মৃত্যুর জন্ত তোমাকে ক্ষমা ক'রবো।”

এই কথা ব'লে শাস্তভাবে ঘুরে সে ত্রুস্তভাবে দরজার ভেতর দিয়ে মিলিয়ে যায়। ঝন্ ক'রে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হারম্যান শুনতে পায়। আবার কে যেন জানালা দিয়ে চায়।

তার সম্বন্ধে ফিরে আসতে কিছুক্ষণ লাগে। সে পরের ঘরটায় যায়। মেঝেতে তার আঁঙ্গুলি ঘুমিয়ে। কষ্ট ক'রে তাকে তুলতে হয়। লোকটা বরাবরের মতই মদ টেনেছে—ঠিকমত উত্তর দিতে সে পারে না। বাতান্নাতের পথের ওপরকার দরজাটায় তালা লাগানো। হারম্যান নিজেই ঘরে ফিরে এনে আলো জ্বলে অনৌকিক ব্যাপারটা লিখে রাখে।

(৬)

জড়জগতে যেমন একই জায়গায় দুটো জিনিস থাকতে পারে না, মনোজগতেও তেমনি দু'টো বন্ধ-ধারণার একত্র স্থান হ'তে পারে না। সেই তিন, সাত এবং টেকা শীগ্গিরই হারম্যানের কল্পনার সেই মৃত্যু কাউণ্টেসের মৃত্তিকে অস্পষ্ট ক'রে দেয়। কোন তরুণীর সাথে দেখা হ'লে ও বলতো, “কি চমৎকার মেয়েটা! ঠিক হরতনের তিনের মত!” শুকে কেউ সময় জিজ্ঞাসা করলে, সে একই রকম উত্তর দিতো, “সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট।” মোটা ভূঁড়িয়াল লোক দেখলেই ওর টেকার কথা মনে হ'তো। তিন, সাত এবং টেকা সব রকম সম্ভবপর আকার-প্রকার নিয়েই ওর ঘুমের মধ্যে হাজির হ'তো। কখনও কখনও গ্রীষ্মদেশের গাছপালার মত ওই তিনটে তাস ওর চোখের ওপর ফুটে উঠতো। সাত নম্বরের তাসকে দেখে যেন মনে হ'তো ‘গথিক’ তোরণ এবং টেকাটা একটা বিরাট মাকড়সা। একটা চিন্তাই তা'কে পেড়ে বসে শুধু—সেটা হ'চ্ছে, যে গোপন কথাটি জানবার জন্ত তাকে এত মূল্য দিতে হ'য়েছে সেটার ব্যবহার। সে অবসর নিয়ে ভ্রমণ করবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। প্যারিস সাধারণ জুয়ারেলার আড্ডায় তার ইচ্ছে হ'তো মায়াবী লক্ষ্মীর কাছ থেকে যে ঐশ্বর্যের ওপর তার লোভ

ছিলো, তা' লুটে নিতে। একটা উপলক্ষ্য উপস্থিত হ'য়ে তাকে হুশিয়ার হাত থেকে মুক্তি দেয়।

মস্কোতে প্রসিদ্ধ চেকালিন্স্কি, যার সারাজীবন কেটেছে তাসের টেবিলে, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা একসময় রোজগার ক'রেছে, তার সতাপতিভ্বে ধনী জুয়ারীদের একটা সমিতি গ'ড়ে ওঠে। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বন্ধুবান্ধবদের বিশ্বাস ওর ওপর জাগিয়ে তোলে। এবং একথানা খোলা বাড়ী, ভালো একজন পাচক, আনন্দ সৃষ্টি-রসিকতা প্রভৃতি মিলে ওর উপর সাধারণের ঐচ্ছা এনে দেয়। এই লোকটা সেন্টপিটার্সবার্গ দেখতে আসে। তরুণেরা আমোদ-স্বুর্ভি ছেড়ে হুড়োহুড়ি ক'রে ছুটে যায় ওর কাছে। নারুমভ্ হারম্যানকে নিয়ে ঘাঘ ওর সাথে দেখা করবার জন্তে।

তারা একসারি জমকালো ঘরের মধ্য দিয়ে যায়—ঘরগুলো শিষ্ট এবং অত্যর্থনারত আঁকালিতে ভরতি। অনেক লোকসমাগম হ'য়েছে। কয়েকজন জেনারেল এবং প্রিন্সিপালিয়ার হুইষ্ট খেলছিলেন। কয়েকজন যুবক কো'চে হেলান্ দিয়ে ধূমপান করছিলো। ডুইংকমের মধ্যে একটা লম্বা টেবিলকে ঘুরে কুড়িজন খেলোয়ার ব'সে, তার মধ্যে গৃহস্বামীও রয়েছেন তার হাতে। বয়স তার ষাট—বেশ সৌম্যমুর্তি। চুল কপোর মত সাদা। তার পুরো গোল মুখথানায় সততার ছাপ। অবিরল হাসিতে তার চোখ দুটো জলজ'লে। নারুমভ্ তার সাথে হারম্যানের পরিচয় করিয়ে দেয়। চেকালিন্স্কি বন্ধুর মত তার সাথে হ্যাণ্ডশেক করে এবং তাকে স্বচ্ছন্দ হ'তে বলে। পেলা আরম্ভ হয়। বাজিটায় বহু সময় লাগে। টেবিলের উপর ত্রিশখানা তাস। প্রতি বার তাস খেলার আগে চেকালিন্স্কি খামে, যাতে খেলোয়াররা ক্ষতি পুথিয়ে নিতে সময় পায়। মনোযোগ দিয়ে ওদের অকুরোধ শোনে—আরও মনোযোগ দিয়ে কোন তাসের ছুমড়ানো কোন ঠিক ক'রে দেয়—কোন বিশৃঙ্খল হাতের চাপে হঠাৎ যা বেকে গিয়াছিলো। শেষে বাজি শেষ হয়।

চেকালিন্সকি তাস ভেজে নিয়ে আবার ফেলতে উদ্যত হয়।

—“আমাকে একটা তাস খেলতে দাও”—পার্শ্বস্থ একজন বলিষ্ঠ লোকের কাঁধের উপর দিড়ে হাত বাড়িয়ে হাবম্যান বলে।

চেকালিন্সকি মুহূ হেসে সম্মতির ভঙ্গিতে নিঃশব্দে মাথা নত কবে। নাকমভ্ হাসতে হাসতে একে সন্দর্ভা জানায়—তাব এই দীর্ঘ উপবাস তত্ত্ব করার জন্য শুভসূচনা আকাশী করে।

—“আমি জিতবো”—তার ভাসেব উপরে ‘চক’ দিয়ে দাগ কেটে হারম্যান বলে।

—“কত”? ক্রকুটি করে চেকালিন্সকি জিজ্ঞেস করে। “আমি ভাল করে দেখতে পারছিনে”।

“সাতচল্লিশ হাজার”—হারম্যান উত্তর কবে।

এই কথ্যতে সমস্ত মাথা এবং সবগুলো দৃষ্টি হাবম্যানের দিকে ফেরে।

—“কি পাগল হ’য়ে গেছে?” নাকমভ্ ভাবে।

—“তোমার বাজী খুব বেশী—যদি আমাকে বলতে দাও তো বলি”—তার চিরহাসিটুকু বজায় রেখেই চেকালিন্সকি বলে। “এখানে কেউ কখনও দু’শো পচাত্তরের বেশী বাজী পবেনি।

—“বেশ আপনি আমার তাস নেবেন কিনা বলুন?” হারম্যান প্রশ্ন করে।

চেকালিন্সকি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

“হ্যাঁ, অবশ্য আমি আপনাকে একটা কথা বলবো—যেহেতু বন্ধুবান্ধবের আমার উপর বিশ্বাস আছে, সেইহেতু আমি নগদ টাকা ছাড়া তাস ছাড়তে পারি না। আমার পক্ষে আপনার কথাই যথেষ্ট, কিন্তু খেলা এবং হিসাবের নিয়ম-কানুন অল্পযায়ী চলতে গেলে, আপনার তাসের উপর টাকা রাখতে বলতে আমি বাধ্য।”

হারম্যান পকেট থেকে একখানা ব্যাঙ্ক নোট বের করে চেকালিন্সকির

হাতে দেয়। সে একবার তাকিয়ে ওটাকে হারম্যানের তাসের উপর রাখে।

সে তাস ফেলতে থাকে। ডান দিকে নহা, বায়ে তিরি।

—“আমি জিতেছি”! তাস উঠিয়ে হারম্যান চীৎকার করে উঠে।

খেলোয়াড়দের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠে। চেকালিন্সকি ঝুটুটি করেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে।

—“টাকা কি দেবেন?” হারম্যান জিজ্ঞাসা করে।

—“আনন্দের সাথে”।

চেকালিন্সকি পকেট থেকে কয়েকখানা ব্যাঙ্ক নোট বের করে হিসাব ঠিক করে ফেলে। হারম্যান টাকাটা নিয়ে টেবিল ছেড়ে চলে যায়। নাকমত্ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলো। এক গ্রাস লেমনেড খেয়ে হারম্যান বাড়ী রওয়ানা হয়।

পরদিন সন্ধ্যায় চেকালিন্সকির বাড়ীতে আবার তাকে দেখা যায়। গৃহকর্তার হাতেই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। হারম্যান টেবিলের দিকে অগ্রসর হয়। খেলোয়াড়রা জায়গা ছেড়ে দেয়। চেকালিন্সকি বন্ধুত্বের ভাবিতে মাথা নাড়ে।

হারম্যান নতুন বাজীর প্রতীক্ষায় থাকে। সে তার তাস ফেলে তার উপর নিজের সাতচল্লিশ হাজার এবং গতকালকার জেতা টাকা রাখে।

চেকালিন্সকি খেলতে থাকে। ডানদিকে একখানা গোলাম পড়ে, আর বাঁ দিকে পড়ে সাত। হারম্যান সাতটা বের করে নেয়।

একটা বিশ্বয়ের তরঙ্গ খেলে যায় সবার ভেতর। চেকালিন্সকি উত্তেজিত হয়ে উঠে। চুরোনকই হাজার চাকা গুণে সে হারম্যানকে দেয়। সে ধীরভাবে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় হারম্যান আবার টেবিলে হাজির হয়। সকলেই তার প্রতীক্ষা করছিলো; জেনারেল এবং প্রতিক্যাউন্সিলাররা তাদের

হুইট খেলা খুয়ে এসে ওই অদ্ভুত খেলা দেখতে থাকে। তরুণ কর্মচারীরা কোচ থেকে লাফিয়ে উঠে, আদর্শগিরি ড্রইংরুমে জমায়েৎ হয়। সকলেই হারম্যানের জন্যে পথ ছেড়ে দেয়। অগ্র খেলোয়াড়রা তাস না কেল হারম্যানের খেলা দেখবার জন্তে অপেক্ষা করে। হারম্যান টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একাই চেকালিন্সকির সাথে খেলবার জন্তে তৈরী হয় চেকালিন্সকি তবুও হাসে—যদিও তার মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুজনেই তাস কাটে। চেকালিন্সকি তাস ভাজে। হারম্যান তার তাস নিয়ে টেবিলের উপর রাখে। একরাশ ব্যাক নোট নিয়ে ওর উপর স্তুপাকার করে ফেলে। যেন একটা দম্ভযুক্ত। গভীর নিস্তব্ধ সব।

চেকালিন্সকি খেলতে থাকে। হাত তার কাঁপে। ডান দিকে রাণী আর বাম ধারে টেকা।

—“টেকা জিতে গেছে।” হারম্যান চীৎকার করে উঠে হাত খুলে দেয়।

—“আপনার রাণী হেরে গেছে।” যুহুসের বলে চেকালিন্সকি।

হারম্যান চমকে ওঠে। সত্যিই টেকার জায়গায় ‘ইস্কাপোনের রাণীকে’ দেখা যায়। সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। কি করে ওটা টেনেছে সে নিজেই বুঝতে পারে না।

—ইস্কাপোনের রাণী যেন ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মিট মিট করে বিজ্রপের ভঙ্গিতে হাসে। অদ্ভুত মিলের জন্তে সে অবাক হ’য়ে যায়।

—“সেই বড়ো ক্রীলোকটা”—আতকে সে বলে ওঠে।

চেকালিন্সকি হেরে-যাওয়া চাকাটা টেনে নেয়। নিকম্পতায় দাঁড়িয়ে থাকে হারম্যান। টেবিল থেকে ও যখন ওঠে যায় তখন একটা উচ্চ গুঞ্জন-শব্দ ওঠে।

—“চমৎকার খেলা।” খেলোয়াড়রা বলে। চেকালিন্সকি আবার তাস ভাজে। খেলা চলতে থাকে।

হারম্যান পাগল হ'য়ে যায়। সে এখন অবহোন্ধি পাগলা গাবদে ১৭নং ওয়ার্ডে আছে। কোনও কথাব উত্তর সে দেয় না। শুধু বিড় বিড় করে বকতে থাকে তিবি, সাত, টেকা! তিবি, সাত, টেকা!

চমৎকাব একজন ছেলেব সাথে লিজাব বিয়ে হয়। ছেলেটা কোন জায়গায় ভাল একটা চাকরী করে, আর খুব বড় সম্পত্তিও আছে তার। মৃত্যু কাউন্টেনের ম্যানেজাবেবর ছেলে সে। লিজাব বাড়ীতে একজন গবীব তরুণী আত্মীয়া আশ্রয় পায়।

টমস্কির উন্নতি হয়েছে—আর বিয়েও হয়ে গেছে তার প্রিন্সেস পলিনার সাথে।

দি ক্লোক

গোগোল

ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু সেই ডিপার্টমেন্টের নাম না দেওয়াই ভালো। তবে সেখানে কর্মচারীকে চটানো বিপজ্জনক—তা সে রেজিমেণ্ট অথবা চ্যান্সারি যা কিছুরই হোক না কেন। আজকাল প্রত্যেক ব্যক্তি তার অস্তিত্বের দ্বারাই সমাজকে বাগিয়ে তোলে। শোনা যায় অল্পদিন আগে পুলিশের একজন প্রধান কর্তা একটা নালি করেন—মনে নেই আমার কোন সহরের লোক তিনি—তাতে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিলেন, গবর্ণমেন্টের আইন কাগজনের অমর্যাদা ঘটছে, এবং এর পবিত্র নাম চিরকাল বৃথাই ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি একখানা প্রকাণ্ড উপন্যাস পাঠিয়ে দেন, যাতে প্রত্যেক দশম অথবা কাছাকাছি কোন পৃষ্ঠায় একজন করে পুলিশের প্রধান কর্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের চরিত্র প্রায় জায়গাতেই উচ্ছৃঙ্খল করে ফোটানো হয়েছে। অতএব, সব রকম সম্ভাব্য অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানোর জন্তই ডিপার্টমেন্টটাকে ‘কোন একটা ডিপার্টমেন্ট’ বলে সম্বোধন করবো। হ্যাঁ, এখন আগেরা বলে যেতে পারি : কোন একটা ডিপার্টমেন্টে একজন কেরানী কাজ করতো। কোন দিক দিয়েই সে বিশিষ্ট ছিলো না—খাটো গড়ন, লাল চুল, অল্প দৃষ্টিশক্তি, কপালে খানিকটা টাক এবং রুক্ষগণ্ড।কার দোষ ? সেন্টপিটার্সবার্গের আবহাওয়ার নিশ্চয়ই।

তার পদ সম্বন্ধে (কারণ সকলের উপরে মানুষের পদটাই আসল) সে বরাবর নামমাত্র কাউন্সিলার বলে পরিচিত—পদটি অনেক লেখকের কাছে কৌতুক এবং তামাসার বিষয়ে পরিণত হয়েছে—যারা প্রতিশোধ নিতে অল্পম তাদের ওপর আক্রমণ করাই এই সব লেখকদের প্রাথমিকীয় অভিপ্সা।

কেরাণীটির পদবী ব্যাসমাচকিন—‘জুতো’ শব্দটি থেকে নিঃসন্দেহে ওর উৎপত্তি। কিন্তু কখন কোথায় এবং কেন এব উৎপত্তি হলো সেটা কেউই জানে না। তার বাপ ঠাকুর্দা, এমন কি শালা পর্যন্ত বাস্তবিক ব্যাসমাচকিনদের সাথে যাদের সম্বন্ধ আছে, তারা সকলেই জুতো পড়তো ; এবং বছরে তিনবার করে তার সোল বদলাতো। তার নাম অর্থাৎ পৈত্রিক নাম আকাকি আকাকিভিচ। পাঠক ভাবতে পাবেন, নামটি অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম। কিন্তু তিনি নিশ্চিত হতে পাবেন যে এ নাম খুঁজে বের করা হয় নি, এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে ওর সৃষ্টি হয়েছিলো। বস্তুতই বিশেষ কোন কারণে অল্প নাম তাকে দেওয়া হয় নি। আকাকিভিচ ভেইশেমাচ’রাতে জন্মগ্রহণ করেন—অবশ্য, যদি আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে না ঠিকিয়ে থাকে। তার মৃত্যু মা, একজন সিম্ভিল সারভেণ্টের স্ত্রী এবং চমৎকাব লোক, ঠিক দময়েই তিনি ছেলেব নামকবৎসর বন্দোবস্ত করেন। দরজার দিকে তাকিয়ে বিছানাব উপর শুয়ে ছিলেন তিনি। ডানদিকে ধর্মবাপ—হুন্দর লোক, নাম আইভ্যান্ আইভ্যানোভিচ্ ইগোরস্কিন্—সিনেটের হেডক্লার্ক তিনি, এবং ধর্মগা আরিনা সেমিগনোভনা বেলোজকোভা—কোয়াটার মাষ্টারের বৌ এবং অশেষ গুণসম্পন্ন স্ত্রীলোক। মাকে তিনটে নাম পছন্দ করতে দেওয়া হয়—মোকিয়া, সোসিয়া অথবা হস্ভাজাটা—মরণবিজয়ীদের নাম অম্মযায়ী।

কি ভয়ঙ্কর নাম !”—সে ভাবলে।

তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য পত্নিকা খুলে আরও তিনটে নাম বের করা হলো—ট্রিফ্লি, ডুলা এবং ভ্যারাহাসি।

“কি ভীষণ নামগুলো ! যেন কোন মতলব নিয়েই ওসব নাম হাজির হয়েছে !”—মা চীৎকার করে উঠে। “ও রকম নামই শুনি নি আমি। ভ্যারাদাত অথবা ভ্যারুই ভোঁ যথেষ্ট বদখৎ, তারপর আবার ট্রিফ্লি আর ভ্যারাহাসি !”

আবার একটা পৃষ্ঠা উন্টানো হয়—প্যাঙ্কসিক্যাহি আর ভ্যাটিলি এই দুটো পাওয়া যায়।

ভাগ্যঃ যেন এ রকম মনে হচ্ছে—মা বলে। ও সব নামের চেয়ে ওর বাপের নামেই রাখা হ'ক—আকাকি! বাপের কাছে যেটা ভালো, ছেলের বেলায়ও সেটা ভালো।”

সুতরাং নাম তার হ'লো আকাকি আকাকিভিচ্। নাম রাখার সময় শিশু কৈদে মূখ বিকৃত ক'রে কেল। তার মূখে এই আভাসই বোধ হয় পাওয়া যায়, যে সে একদিন নামমাত্র কাউন্সিলার হবে। এরকমভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিলো। আমরা ঘটনাটা উল্লেখ ক'রলাম এই জন্য যে, ছেলেটার অন্য নাম দেওয়া সম্ভবপর ছিলো না।

কখন এবং কিতাবে সে ওই ডিপার্টমেন্টে ঢোকে এবং কে তাকে নিযুক্ত করে কেউই মনে করতো না। ডিরেক্টর এবং 'হেড'র পরিবর্তন হলেও তা'কে ঠিক এক জায়গায়, এক পদে, একই কাজে, এবং একই রকম লেখার ভিত্তিতে আবদ্ধ থাকতে দেখা যেতো। সুতরাং লোকে ভাবতো যে, সে একেবারে তৈরী হ'য়েই ওই দকমতাবে জন্মগ্রহণ করেছে—ইউনিকর্ম, টাক এবং সব কিছুই। সে হলে ঢুকলে আদর্শলিরা আসন ছেড়ে তো উঠতোই না, একটা সাধারণ মাটির চেয়ে তাকে বেশী গ্রাঙ্ক ক'রতো না। উপরওয়ালার সাথে বরাবর ব্যবহার ক'রতো মৌন কলহতায়। কোন হেড ক্লাকের কেরানী তার নাকের ওপর দিয়েই এক তাড়া কাগজ ফেলে দিতো—এমন কি বলাও দরকার মনে করতো না যে এগুলো দয়া করে নকল ক'রবেন কি? অথবা, এই নিন্ খুব ভালো একটা কাজ—অথবা কোন রকম শিষ্ট কথা যা' কোন সুব্যবস্থিত অফিসেই শোনা যায়। আর, সে তার দিকে চোখ না তুলেই, অথবা তার অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলেই, কাগজগুলো তুলে দিতো, এবং তৎক্ষণাৎ নকল করতে আরম্ভ করে দিতো। ছোট কেরানীসকল

তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হাসতো এবং চোখাচোখা রসিকতাভরা কথা ওর ওপর প্রয়োগ করতো—অবশ্য, আফিসের গণ্ডীতে যতটা রসিকতা সম্ভব ততটুকুই। নানারকম গল্প ওর সম্বন্ধে বানিয়ে ওর সামনে সেগুলো বার বার করে বলতো। উদাহরণস্বরূপ, সত্তর বছরের বড়ী ওর গৃহকর্ত্রী ওকে ঠেঙায়—এই রকম সব গল্প। তার সম্বন্ধে ওকে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রূপ করতো, জিজ্ঞাসা করতো কবে ওদের বিয়ে হ'চ্ছে। আর কাগজের ছোঁড়া টুকরো তার মাথার ওপর ছুঁড়ে দিতো—যেন খই ছিঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর কি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত কোন ফল করতে না ওসবের—যেন ওসবের সাথে ওর কোন সম্বন্ধ নেই। তার কাজের ও বাধা হতো না ওতে। যতক্ষণ রহস্য চলুক না কেন, ওর কাজের একটুও জ্বল হতো না। শুধু যখন কোন তামাসাকারী তার কন্ঠহীনে ধাক্কা দিতো, তখনই তার ধৈর্যের বাঁধ যেতো ভেঙ্গে, এবং সে জ্বলে উঠে বলতো, “আঃ আমাকে একা থাকতে দিন! কেন আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন?” কথাটার ভাষা ও স্বরে একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিলো, যাতে সমবেদনা জাগিয়ে তোলে। একজন নতুন নিযুক্ত ছোকরা অস্ত্রান্তর দেখাদেপি ওর সাথে রহস্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু হঠাৎ সচকিত হ'য়ে সে নিজেকে সংযত ক'রে ফেলে, এবং তার পর থেকে তার সবই বদলে যায়, সে আকাঙ্ক্ষিত নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। কোন অস্বাভাবিক শক্তি বন্ধুদের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যায়—যাদের সে মনে মনে বেশ সম্ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলো। বহুদিন পর কোন আনন্দময় মুহূর্তে সেই টাকপড়া তরুণ কেরাণীটির কথা তার মনে হ'তো, এবং তার মর্মস্পর্শী কথাও—“আঃ, আমাকে একা থাকতে দিন! কেন আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন?” এই কথাটার আড়ালে সে যেন এই সংযত কথাটাও গুনতে পেতো, “আমি কি আপনাদের তাই নই?” হৃৎভাগ্য মুক হাত দিয়ে মুখ

ঢেকে, যে যুগে সে বাস ক'রছে এবং যে যুগে মানুষ এত নিষ্ঠুর, এবং তার মাজিত সৌজন্নের মধ্যে এতখানি অর্থহীন নৃশংসতা, সেই যুগের কথা চিন্তা করে কঁপে উঠতো। হায় ভগবান! জগৎ থাকে এমনি সং এবং সম্মানীয় বলে মনে করে সেই মানুষই এই!

আকাকির মত কাজে কেউই ডুবে থাকতো না। এটা অল্পই বলা হবে যে সে উৎসাহের সাথে কাজ করতো—রীতিমত অন্তরাগ ছিলো তার কাজের উপর। 'কাজ নকল করা তার কাছে খুলে দেয় এক নতুন জগৎ—মধুর এবং বৈচিত্র্যময় জগৎ। যখন সে কাজে বসতো তখন তার মুগের ওপর ফুটে উঠতো একটা তৃপ্তি। আর তার প্রিয় চিঠিগুলো এলে সে হাসতো, চোখ মিট মিট করতো এবং ঠোঁট নাড়তো—ফলে তার মুখ দেখে একজন নিশ্চয় বলতে পারতো, কোন চিঠি সে লিখেছে। উৎসাহ অন্তরায়ী যদি তার উন্নতি হতো, তবে এতদিনে সে ষ্টেট কাউন্সিলার হয়ে যেতো। কিন্তু সহযোগী কেরাণীর দল তাহার সম্বন্ধে বলাবলি করতো—কাজের সাথে তাকে আটা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর এর একমাত্র পুরস্কার সে পেয়েছে—চিঠির স্তুপ। কিন্তু এটা বললে অন্যায় বলা হবে যে, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। একজন ডিরেক্টর—একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—তার দীর্ঘ চাকুরীর জন্য তাকে পুরস্কৃত ক'রতে চেয়ে ঠিক করেছিলেন, ওকে নকল করার বদলে অন্য প্রয়োজনীয় কাজে দেওয়া হবে। আর প্রথম কাজ যেটা তার ভাগ্যে পড়েছিলো—সেটা হয়েছে একখানা পরিসমাপ্ত দলিল—যার প্রথম পৃষ্ঠাটা এবং পুরুষের ক্রিয়ার অদল বদল ক'রতে হবে। এতে আকাকির এত কষ্ট হতে লাগলো যে সে যেমে উঠলে এবং একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—“দয়া ক'রে এর বদলে কিছু নকল ক'রতে দিন আমাকে।” সে দিন থেকে তাকে নকল করার কাজেই রাখা হয়।

নকল করা ছাড়া তার আর অন্য কিছু কাজ ছিলো না। পোষাক

সম্বন্ধে কোনদিনই তার খেয়াল ছিলো না। তার ইউনিকর্মের রং আর সবুজ নেই—মলিন শুক তার রং। কলারটা তার নচু এবং ছোট। গ্রীবা লম্বা না হলেও অস্বাভাবিক রকম লম্বা ব'লেই মনে হচ্ছিলো—মাথায় ট্রেনে—বাওয়া বিদেশী ভেঙারের মত। আর তার কোটে কিছু না কিছু লেগেই থাকবে—হয় খড়, নয় সূতো। তার একটা অদ্ভুত ঝোঁক ছিলো—কোন বড়ীর লোক যখন রাস্তায় রাবণ ফেলতো, ঠিক সেই সময়ে তার জানলার ধার দিয়ে যাওয়া চাই—ফলে রোজই তাকে টুপির উপর তরমুজ অথবা কুমড়োর টুকরা নিয়ে যেতে হ'তো। বাস্তায় দৈনন্দিন কি ঘটছে না ঘটছে। সে সবেই ওপর সে একটাও নজর দিতো না। তার সহযোগী কেরানীদের তীব্র দৃষ্টি কিন্তু আসল বন্ধনী অথবা উন্টোদিকে ঝুলে-পড়া পায়জামা আবিষ্কার করতে ভুল ক'রতো না—এ সব ঘটনায় সবসময়ই ওদের ঠোঁটে একটা বিজ্ঞের হাসি ফুটে উঠতো।

আকাক্ষিকি যেদিকেই চাইতো সেই দিকেই তার ঝরঝরে সুবিন্যস্ত লিখিত দলিলগুলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়তো না। শুধু যখন কোন ঘোড়া তার কাধের উপর গুতো দিতো, অথবা তার মুখের ওপর নাকের ঘড় ঘড় শব্দ করতো, তখনই মাত্র সে বুঝতো যে সে রাস্তার মধ্যে আছে, দলিলের মধ্যে নয়। বাড়ী পৌঁছে সে টেবিলের ধারে গিয়ে বসে এক টুকরা মাংস এবং তার ঝোল আর পেঁয়াজ খেতো—তাদের হৃদ অস্ত্র ভব করতে, কিনা সন্দেহ—মশা, মাছি এবং ভগবান দয়া করে যা দিতেন সবশুদ্ধ সে খেয়ে ফেলত। পেট ভরলে টেবিল ছেড়ে উঠে দোয়াত নিয়ে বাড়ীতে-আনা কাগজপত্র নকল করতে বসতো। আফিসের কোন কিছু নকল করবার না থাকলে সে নিজের জন্যই নকল করতে বসতো—বিশেষত দলিলটা যদি মূল্যবান হতো,—তার ভেতরের লিখিত জিনিসের জন্য নয়, কোন প্রসিদ্ধ লোককে লেখা হয়েছে বলে।

এমন কি সেন্টপিটার্সবার্গের ধূসর আকাশ ফিকে হয়ে গেলে যখন

সিভিল সার্ভিসের লোকেরা নিজের নিজের সাখা এবং স্বাদ অমুখ্যায়ী উৎকৃষ্ট খাবার খেতো, যখন কলম-পেশা অথবা অন্যান্য কাজের বাজাট থেকে মুক্তি নিয়ে সকলে বিশ্রাম করতো, যখন প্রত্যেক কর্মী ব্যক্তি সেই অবকাশকে অবাধে উপভোগ করবার নেশায় নিয়োজিত করতো, এবং তাদের মধ্যে বেপরোয়া গোছের যারা তারা থিয়েটারে ছুটতো, অন্য সবাই টুপির দোকান ঘুরতে রাস্তায় বেড়াতো—অথবা সাক্ষ্য মজলিসে যেতো স্তম্ভরীদের সাথে প্রেমালাপ করবার জন্য, আর অনেকে সহযোগী কেরানীদের সাথে সন্ধ্যা কাটাতে যেতো—যারা কেমন বাড়ীর তিন তলা কিংবা চারতলায় ছোট ছোট ঘরে বাস করতো..... এক কথায় যখন সকলেই প্রাণপণে আনন্দে ডুবে থাকতে চেষ্টা করতো, তখনও আকাক্ষিভিচ অন্য বিষয়ে একটুও নিজকে প্রস্রয় দিতো না। তাকে কেউ কোন দিন সাক্ষ্য মজলিসে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। প্রাণভরে লিখে সে শুতে যেতো এবং আগামীকালের প্রত্যাশায় তার মুখে মুহূ হাসি রেখাচিত্র হয়ে উঠতো। কাল তাকে কি নকল করতে দেওয়া হবে এই ভেবেই ওই সামান্য ধরণে ওং জীবনের খারা বয়ে চলতো,—নিজেব ভাগ্যে সে সন্তুষ্ট ছিলো। হয়তো বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই ভাবেই চলতো,—যদি না জীবনের কতকগুলো অপ-বিহার্য দূর্ভাগ্য, যা জীবন-পথের উপর ছড়িয়ে থাকে, তা এসে উপস্থিত হতো, এবং .য দূর্ভাগ্য শুধু এই সমস্ত গোত্রহীন কাউন্সিলারদেরই পাওনা নয়, প্রতি কাউন্সিলার, এমন কি যারা কোনরকম পরামর্শ বিনাময় করে না, তারাও এই দূর্ভাগ্যের অংশীদার।

সেন্টপিটার্সবার্গে যাদের মাইনে চারটে। কবলের বেশী নয়, তাদের প্রত্যেকের কাছে উত্তরে তুষারবৃষ্টি ভয়ানক শব্দ, যদিও কোন কোন লোক বলবেই যে ওটা স্বাভাবিক। সকাল নয়টার যখন সিভিল সার্ভিসের কেরানীরা

অফিসে ছোট্টে এবং তাদের ভীড়ে রাস্তা পূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তুষারপাতটা এত তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে যে, বেচারারা তাদের নাকটাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পাব না। বড় বড় অফিসারদের মাথাও যখন তুষারের আধাতে টাটিয়ে ওঠে, চোখে জল নেমে আসে, তখনও হতভাগা কেরাণীর দল সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় থাকে প্রায়ই। একমাত্র মুক্তির উপায় হচ্ছে পাঁচ ছয়টা রাস্তা খুব তাড়াতাড়ি ছোট্টা—গায়ে তাদের পাতলা টিলে জামা—তারপর আদালতের ঘরে গিয়ে পাঁটাকে গরম করা, এবং এইভাবে পথে-অপচয়-করা শক্তি এবং সামর্থ্যকে ফিরে পাওয়া। আকাক্ষিতিক লক্ষ্য করলে একদিন যে তার পিঠ আর কাধের উপর তুষারে ভয়ানক রকম ব্যথার সৃষ্টি করেছে—প্রাণপণে অফিসে ছোট্টা সম্বোধন। শেষে তার মনে হলো যে তার জামাটার হরতো কোন ক্রটি হয়েছে। বাড়ীতে ভাল করে পরীক্ষা করে সে বের করে—হুঁতিনটে জায়গায় বিশেষ করে পিঠের এবং কাধের জায়গাটা একেবারে ফালি ফালি হয়ে গেছে এবং কাপড় থেকে স্রোত গলে গেছে। পাঠকদের এখানে বলা দরকার যে আকাক্ষিতিকের জামাটাও তার সহযোগীদের হাসি ঠাট্টার বস্তু ছিলো। এটাকে ঠাট্টা করে ড্রেসিং গাউন বলা হতো। আর বাস্তবিক ওর ছোটকাটও বড়ই অদ্ভুত। বছরের পর বছর ধরে ওর কলারটা ছোট হয়ে আসছে—কারণ ওরই অংশ-বিশেষ নিয়ে অল্প জায়গায় তালি দেওয়া হয়েছে, তার তালিগুলো আবার দরজির দেওয়া নয়—সেগুলো এলোমেলোভাবে ন্যাপটে রয়েছে, এবং দেখতে ২৫ঘেছে বিকট।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরে আকাক্ষিতিক দরজি পোট্রোভিচের কাছে জামাটা নিয়ে যাবে বলে ঠিক করলে। একটা বাড়ীর চারতলায় পেছনের দিককার সিড়ির ঘরে ও থাকতো। সিডিল সাভিসের কেরাণী এবং অন্যান্য লোকের জামা কাপড় মেরামত করে সে অপেক্ষাকৃত লাভজনক ব্যবসা চালাচ্ছিলো—অবশ্য যখন সে প্রকৃতিস্থ থাকতো এবং অল্প কোন

ব্যাপারে তার মন দিতো না। এই পেট্রোভিচের নাম আমরা উল্লেখ করতাম না—কিন্তু যখন করা হয়েই গেছে এবং যখন নিয়ম আছে গল্পে যার নাম উল্লেখ করা হবে, তার সম্বন্ধে কিছু বলতেও হবে—তাই আমরাও ও কথা পাড়ছি। বহুদিন আগে সে শুধু গ্রেগরী নামেই পরিচিত ছিলো, যখন সে কোন জমিদারের দাস ছিলো—এ তখনকার কথা। তার মুক্তির পরই সে পেট্রোভিচ নামে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছে; আর সেই সাথে ছুটি এবং উৎসবের দিন প্রচুর নেশাও করতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম খুব বড় বড় উৎসবের দিনই সে মদ খেতো, কিন্তু পরে নিষিদ্ধারে চাচ পস্তিকার যে দিনটাতেই ক্রুশ চিহ্ন আঁকা আছে সেইদিনই তার নেশা চলে—এ বিষয়ে সে পূর্বপুরুষদের অভ্যাস বজায় বেখেছে। আর স্ত্রী সাথে ঝগড়া করার সময় বৌকে বৈষয়িক স্ত্রীলোক বা একজন জার্মান বলে সে বিদ্রূপ করতো। তার স্ত্রীর কথা যখন বলেছি তখন তার সম্বন্ধে ত একটা কথা বলা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সম্বন্ধে অল্পই জানা গেছে। শুধু এইটুকুই শোনা গেছে যে পেট্রোভিচের একজন স্ত্রী ছিলো এবং সে টুপিও পড়তো—রুমাল নয়। সৌন্দর্য নিয়ে বড়াই করার তাব কিন্তু কিছু ছিলো না, কারণ, রাস্তায় দেখা হ'লে সৈন্তবাই শুধু ওর টুপির নীচ দিয়ে উঁকি মারতো। কিন্তু তারা ফি-বারই মুখ কাচুমাচু করে ফেলতো আর অদ্ভুতভাবে চীৎকার করতে থাকতো। পেট্রোভিচের ঘরে যাবার সিঁড়িতে উঠতে, এবং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যা' উপস্থিত জল কিংবা ওইরকম কোন তরল জাতীয় জিনিস দিয়ে ধোয়া হয়েছিল, এবং চোখ জ্বালাকর স্পিরিট জাতীয় জিনিসের তীব্র গন্ধে ভরপুর ছিলো, আর সেন্টপিটার্সবার্গের সব সিঁড়ির ঘরেই বার সাথে সকলেই সুপরিচিত—হ্যাঁ, সেই সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আঁকাবিঁচি ভাবছিলো পেট্রোভিচ কাকটার জগৎ কত চাইবে—মসে মনে সকল করছিলেন সে যে ছ'

কবলের বেশী দেওয়া হবে না কিছুতেই। পেট্রোভিচের ঘরের দরজা খোলাই ছিলো, কারণ তার স্ত্রী কোন মাছ রান্না করছিলো, আর রান্না ঘরটা এমন গন্ধে ভরে গিয়েছিলো যে আরসোলোগলোকেও আর দেখা যাচ্ছিলো না। ওর স্ত্রীর অলঙ্কো আকাকিভিচ রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে গিয়ে একটা ঘরে ঢোকে, যেখানে পেট্রোভিচ সাদসিখে একটা টেবিলের ওপর বসেছিলো। আকাকিভিচের নজরে যেটা প্রথম পড়লো সেটা হচ্ছে কুৎসিত নখযুক্ত একটা পরিচিত বিরাট বুড়ো আঙ্গুল—কাছিমের গিঠের মত দৃঢ় এবং পুরু। রেশম এবং সূতোর ফেটি পেট্রোভিচের ঘাড়ে ঝুলছে, আর হাটুর ওপর তার কতকগুলো করো কাপড়। কয়েক মিনিট থেকে সে ছুঁচে সূতো পড়াতে চেষ্টা করছিলো। শেষে, অস্বস্তিকার এবং সূতোর উপর চটে ওঠে সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে, দুস্তোর শালা, ও কিছুতেই চুকবে না, মরুক গে। আকাকিভিচ বিরক্ত হ'য়ে ওঠে এই ভেবে যে, সে এমন সময় এসেছে যখন পেট্রোভিচের মেজাজ খারাপ। সে পেট্রোভিচের সাথে দামদস্তুর ঠিক করতে চায় তখন, যখন তার মেজাজ রুদ্ধ থাকে না। সেই সময় সহজেই সে দাম কমিয়ে থাকে, এমনকি খন্দেরকে মাথা চুইয়ে বগাবাদও জানায়। এটা সত্যি যে ওইরকম সময় তার স্ত্রীও ওই জায়গায় হাজির হয়, এবং দুঃখ করতে থাকে যে মদ খাওয়ার জগুই তার স্বামী অল্প দাম চেয়েছে—কিন্তু তার অর্থ শুধু আরও বিশ কোপেক, তারপরই ব্যাপারটা চুক যায়। এ দিন মনে হলো, পেট্রোভিচ সূস্থ অবস্থায় আছে—তার ফলে সে হয়ে আছে নীরব এবং লোলুপ। আকাকিভিচ ফিরেই যেতে—কিন্তু বড্ডই দেরী হয়ে গেছে। পেট্রোভিচ একটা চোখ তার ওপর স্থির করাতে আকাকিভিচ অনিচ্ছাসহেও বলে—নমস্কার, পেট্রোভিচ।

—“নমস্কার”—পেট্রোভিচ উত্তর করে. আর ওর হাতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে যে কি রকম শিকার ও আনছে।

—এই, তোমার কাছে এসেছি পেট্রোভিচ, কারণ

লক্ষ্য করতে হবে যে আকাকিভিচ এমন সব শব্দ ব্যবহার করছে যার অর্থ খুব কমই হয়। জটিল বিষয় হলে সে কখনও কথা শেষ করতো না, এবং প্রায়ই এই সমস্ত কথা দিয়ে আরম্ভ করতো।

—“এটা ঠিক, সম্পূর্ণ—তবে ” এর পরে আর কোন কথা থাকতো না। আকাকিভিচ ভাবতো যে সে নিজের কথা যথেষ্ট পরিষ্কার করেই বলেছে।

—“আচ্ছা দেখি ওটা কি ?”—পেট্রোভিচ বললে—এক চোখ দিয়ে সে জামাটার কলার থেকে হাতা পর্যন্ত এবং প্রান্ত থেকে বোতামের ঘর পর্যন্ত পরীক্ষা ক’রতে থাকে, যদিও ওটা তারই তৈরী এবং ওর প্রত্যেকটি ফাঁর ওর পরিচিত। কিন্তু ওটা দরজিদের নিয়ম—খন্দের কোন কাজ আনলে প্রথমে ওরা ওই করে।

—“আমি এসেছিলাম পেট্রোভিচ...জামাটা . কাপড়টা.. একটু ময়লা...এটাকে পুরোনো দেখায়। কিন্তু এটা খুব ভালই আছে, শাস্তবিক... খালি এখানে ওখানে, তুমি দেখতে পাচ্ছ ..পিঠ এবং কাঁধটা একটু ছিঁড়ে গেছে, এবং এধারের কাঁধে একটু...দেখছো ? কিন্তু খুব বেশি কিছু ক’রতে হবে না এর.....”

পেট্রোভিচ টেবিলের ওপর ওটাকে রেখে অনেকক্ষণ ধ’রে পরীক্ষা করে। একটু একটু মাথা নাড়তে থাকে ও। তারপর জানালার ধারে গিয়ে একটা গোল নস্যির কোটোটা তুলে নেয়—তার মুটকীতে একজন জেনারেলের ছবি আঁকা—কিন্তু কোন্ জেনারেল কেউই বলতে পারে না—কারণ তার মুখটার রং উঠে গেছে এবং একটা কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে সেখানে। পেট্রোভিচ এক টিপ নস্যি নিয়ে জামাটা আলোর উপর তুলে ধরে আর একবার মাথা নাড়ে। তারপর সেলাইটা পরীক্ষা করে

আবার মাথা দোলায়। ফের আর এক টিপ নস্য নিয়ে জেনারেলের ছবি এবং কাগজ-আঁটা খাপটা সশব্দে বন্ধ করতে করতে শেষে বলে—

—এটা মেরামত কবা চলবে না। কাপড়টা একেবারে গচে গেছে।”

—আকাকিভিচেব মন হতাশায় তলিয়ে যায়।

—“কিন্তু কেন চলবে না পেট্রোভিচ?” ছেনেমি এবং অল্পকুল যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করে। “কাঁধটাব উপর শুধু একটু ছিঁড়ে গেছে। আমার মনে হয়, দু’ এক টুকরো কাপড় দিলেই.....”

—“আমার যথেষ্ট কাপড়ের টুকরো আছে”, পেট্রোভিচ বলে, “টুকরোর কোন আকাল হয় নি আমাদের কাছ—কিন্তু কাপড়টা এত গচে গেছে যে জোড়া দিলে থাকবে না। একটা ছুঁচ দিবে ছলেই এটা খুলে পড়ে যাবে।”

—কিন্তু তুমি তো টুকরোগুলো তালি দিতে পাব।”

—এতে এমন কোন পদার্থ নেই যাতে তালি টিকে থাকবে। কাপড়টা একেবারে বুঝুঝুয়ে হয়ে গেছে—জোব একটা বাতানট ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে।”

—“তাহলে তুমি এটাকে শক্ত করে দাও। নিশ্চয়ই এটা... ..”

—“অসম্ভব”, পেট্রোভিচ দৃঢ়ভাবে বলে। “জামাটা এত অপদার্থ যে ওকে মেরামত করা আব চলবে না। শীতের সময় আপনি এটাকে কেটে পায়ের আচ্ছাদনী তৈরী করতে পারবেন। ষ্টকিং একটুও গরম নয়। জার্মানরা আমাদের ট্যাংক থেকে আরও টাকা খসাবাব জ্ঞাত ওটা বের করেছে।” পেট্রোভিচ স্বয়ংগপেলেই জার্মানদের বিক্রম করে। “আব জামাটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় আপনাকে একটা নতুনই বানাতে হবে।”

—“নতুন” শব্দটা বলায় আকাকিভিচ এর চোখের সামনে জেনারেলের চেহারা ঝাপসা হয়ে ওঠে, আর ঘরের মধ্যকার সব জিনিসগুলো

দুলতে থাকে। সে ববং কাগজের টুকরো-আটা পেট্রোভিচের নগ্নির কোটোটা শুধু স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

—“নতুন”! সে যেন স্বপ্নের ঘোরে প্রবৃত্ত করে। “কিন্তু আমার টাকা পয়সা একেবারেই নেই।”

—“হ্যাঁ, আমার মনে হয় নতুন”—কঠিন শাস্ততায় একই কথার পুনরুক্তি করে পেট্রোভিচ।

—“আর যদি আমি সত্যিই বানাই, তাহলে কত.....”

—“দামের কথা বলছেন?”

—“হ্যাঁ।”

—“দেড়শো রুবল বললে অল্প বলা হয়”—অর্থমূলক ভাবে ঠোঁট কামড়িয়ে পেট্রোভিচ বলে। সে এই প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। খদ্দেরকে বিহ্বল করে দিয়ে পবে ওর দিকে নৃশ্বর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে যে তার কথার ফল কেমন হয়েছে।

—“একটা জামার জন্যে দেড়শো রুবল!!!” আকাঙ্ক্ষিত চীৎকার করে ওঠে। জীবনের এই সর্বপ্রথম সে চীৎকার করে। শাস্ত কথার জন্ত তার খাতি ছিলো।

—“হ্যাঁ”—পেট্রোভিচ উত্তর দেয়। “আর ওকে সেরকম জামাও হবে না। মার্গেন্টে কলার হলে লোমঘুক্ত পিঠে রেশমের কাজ করলে দু’শো রুবল লাগতো আপনার।”

পেট্রোভিচের কথা গ্রাহ্য না করে এবং ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রেখেই সে বলতে থাকে, “যাতে জামাটা আরও কিছুদিন টেকে তারই একটু চেষ্টা কর পেট্রোভিচ।”

—“ও একটুও ভাল নয়, শুধু শুধু টাকা আর পরিশ্রম ব্যয়”, পেট্রোভিচ বলে। এতে আকাঙ্ক্ষিত একেবারে মূসরে পড়ে ঘর থেকে চলে যায়। তার দাবার পরে অনেককাল পরবর্ত্ত পেট্রোভিচ স্থিরভাবে গাড়িয়ে থাকে—

ঠোঁট ছুটো, কঠিনভাবে চেপে ধরে রাখে সে। সে যে নিজকে অথবা ব্যবসার মর্যাদাকে খেলো করে ফেলে নি এতে খুশী হয়ে ওঠে ও।

আকাক্ষিত চম্পাঙ্কনভাবে রাস্তায় চলতে থাকে। “চমৎকার ব্যবসা নিশ্চয়ই”, সে নিজেকে বলে বলতে থাকে। “সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি যে এটা” ... এবং একটু থেমে সে বলে থাকে— “তা হলে এই হলো! ওঃ আমি ভাবতে পারি নি যে শেষটা এরকম দাড়াবে।” বহুকণ নীরব থাকার পর সে আবার বলে, “ওঃ কে ভেবেছিলো?”

... “কি ভীষণ ব্যাপার!” এই কথা বলবার পর সে বাড়ীর দিকে না গিয়ে আনমনাভাবে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। অল্পদূর যেতে না যেতেই একটা নোংড়া চিমনী-মোছা ঝাঁটা তার পায়ে পড়ে কাঁধটার একটা কালো দাগ ফেলে দেয়। আর একটু দূরে আধা-তৈরী একখানা বাড়ী থেকে খানিকটা চুন ওর গায়ে পড়ে। কিন্তু কোন বিষয়েই ওর হৃণ নেই। যখন একজন পুলিশের গায়ে ওর দাক্ষা লাগে—পুলিশটা বেয়নেট পাশে ঝুলিয়ে একটা বাস্তু থেকে খানিকটা তামাক নিয়ে তাব কঠিন হাতে রাখছিলো—তখনই শুধু সে কোন রকমে নিজেকে সচকিত করে তোলে—তাও আবার পুলিশটা তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করে বলে—“কোন জাহাঙ্গিরে যাচ্ছ তুমি? ঠিক পথ দিয়ে কেন চলছো না?”

এর ফলে সে চারিদিকে চেয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে। তখনই শুধু সে ঠিক মত চিন্তা করতে পারে এবং নিজের অবস্থাটা ঠিক গত বুঝতে পারে। সে নিজেকে নিজেকে কথা বলতে আরম্ভ করে—ছাড়া ছাড়া ভাবে নয়, পরিষ্কার স্বস্তির সাথে—যেমন একজন বুদ্ধিমান বন্ধুর সাথে কথা বলে—যার কাছে সে ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ প্রার্থনা করেছে। ‘নাঃ, আস্ত পেট্রোভিচের সাথে কথা বলে লাভ নেই। সে এখন..... সে তার জীবন কাছে মার খেয়েছে নিশ্চয়ই। রবিবারের সকালে বরং ওর কাছে যাওয়া উচিত। সে সময় মদ খেতে তার টাকার দরকার। জী মদ

খাবার জন্ত তাকে কিছুই দেবে না। শুধু কুড়িটা কোপেক তার হাতে গুঁজে দিলেই সে একটু বাধ্য হবে, আর তারপরে জামাটা.....” এই ভাবে আকাক্ষিত্বে নিজে নিজেই বিচার করে সাহস বজায় রাখতে চেষ্টা করে। আর ঠিক রবিবারে যখন পেট্রোভিচের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেখে ঠিক তক্ষুনি সে সোজা সেই দরজির কাছে গিয়ে হাজির হয়। এখানে বলা যেতে পারে—শনিবার রাতে মদ খাবার পর পেট্রোভিচ তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলো। এক চোখ পাکیয়ে সে মাথা ছুইয়ে ফেলে, কিন্তু যেই বোঝে তার কাছে কি চাপুষ্য হচ্ছে অমনি যেন শয়তান ভর করার মতই বলে ওঠে, “পারব না আমি। তোমাকে নতুন একটা বানাতেই হবে।”

আকাক্ষিত্বে কুড়িটা কোপেক তার হাতে গুঁজে দেয়।

—“ধন্যবাদ মশায়,” পেট্রোভিচ বলে। “আপনার উদ্দেশ্যে এক গ্লাস স্বাস্থ্য পান করবো। আর জামার জন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না। এটা আর কোন কাজেই লাগবে না। আপনার জন্ত একটা নতুন মেখে তৈরী করে দেবো নিশ্চয়ই।”

আকাক্ষিত্বে ফের সেই মেরামতের কথা তোলে, কিন্তু পেট্রোভিচ তার কথা কানই দেয় না।

—“আপনাকে একটা নতুন জামা তৈরী করে দেবো”, সে বলে—“আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন; যতদূর সম্ভব ভালো করে বানাতে চেষ্টা করবো। আমি নতুন ফ্যাশানে তৈরী করতে পারি—কলারে রূপালি কাজ করা।

আকাক্ষিত্বে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে—কারণ সে বোঝে যে নতুন জামা বানানো ছাড়া গত্যন্তর মেই। কিন্তু কি করে সে বানায়? এর টাকা কোথায় পাবে সে? সামনের ছুটিতে বোনাস্টা পাবে অবশ্য—কিন্তু সেই টাকা তো ভাগ করে খরচ করা সম্বন্ধে ঠিক করা হয়ে গেছে। নতুন

পাঞ্জাবী তার দরকার—মুচিটাকেও জুতো সারানোর জন্য টাকাটা শোধ করতে হবে। তিনটে সার্ট আর দুটো ইজেরের অর্ডার তাকে দিতে হবে। এক কথায় বলা চলে, টাকা সবটাই খরচ হয়ে যাবে; আর বড় বাবু যদি দয়া করে চল্লিশ রুবলের জায়গায় পয়তাল্লিশ অথবা পঞ্চাশ রুবলও দেন, তা হলেও সেটা নগণ্য—‘ক্লোক’ বানাতে সেটা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ। যদিও সে জানে যে, পেট্রোভিচ মাঝে মাঝে এমন দাম চেয়ে বসে, যাতে তার স্ত্রীকেও অবাক হয়ে চীৎকার করে বলতে হয়,—“তুমি কি উন্মাদ, নিবোধ? একদিন তুমি বিনা পয়সায় কাজ কর. আর একদিন তুমি এত দাম চাও, তোমার নিজের দামও যা নয়।”

আশি রুবলে পেট্রোভিচ ওটা বানাবে। কিন্তু আশি রুবলই বা পাওয়া যায় কোথায়? সে অধেকটা হয়তো যোগাড় করতে পারে, হয়তো আর একটু বেশিও পারে—কিন্তু আর অধেকটা আসবে কোথা থেকে? পাঠকের প্রথমে জানা দরকার, প্রথম অধেকটা কোথা থেকে জুটবে? প্রতি রুবল ব্যয়ের জন্য আকাক্ষিত্বের দৃষ্টান্তে কোপেক জমানো অভ্যাস। সেটা সে বড় একটা ব্যক্তির মধ্যে রাখে—ছ’মাস অন্তর সেগুলো ভাঙিয়ে রূপোর টাকায় পরিণত করে। এই ভাবে অনেক বছর ধরে সে চল্লিশ রুবল জমাতে সক্ষম হয়। কিন্তু আর অবশিষ্ট টাকাটা কোথেকে সে যোগাড় করবে? এই সমস্যায় বিহ্বল হয়ে সে স্থির করে যে সে এক বছরের জন্য তার সাধারণ খরচ কমিয়ে দেবে। সন্ধ্যার চা’টা সে বন্ধ করতে পারে—আর মোমবাতি না হলেও তার চলে। সন্ধ্যায় কাজকর্মের দরকার হলে সে সব সময়ই গৃহকর্তার ঘরে যেতে পারে। রাস্তায় পাথরের উপর দিয়ে সে খুব আন্তে আন্তে হাটবে, আঙ্গুলের ডগায় ভর দিয়ে সে চলবে—যাতে জুতোর চামড়া ক্ষয় না হয়। কাপড়-জামা সে দেবীতে কাচতে পারাবে—আর কতদিন সম্ভব পরিষ্কার রাখবার জন্য সন্ধ্যার সময়ই সে তার কাপড়

চোপড় খুলে কেলে সেই পুরানো তুলোর ড্রেসিং গাউনটা পড়বে।

সত্যি ক'রে ব'লতে গেলে ব'লতে হয়, এই দুঃখের সাথে খাপ খাওয়াতে তার বেশ কষ্ট হ'তে লাগলো প্রথমটা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেলো। ক্ষুধাত সন্ধা-গুলোর কাছেও সে নতি স্বীকার ক'রে নেয়—সামান্যস্বরূপ ভবিষ্যৎ ক্লোকটার চিন্তায় খানিকটা মানসিক স্ব্থ জোটে। সেই কটা দিন ওর মনে হ'তো যেন ওর জীবনটা ঐশ্বর্যময়ী হ'য়ে উঠেছে—যেন তার বিয়ে হ'য়েছে, যেন কোন লোক অর্থ্যাৎ কোন প্রিয় বন্ধু, যার সাথে সে জীবনের পথ মাড়িয়ে এসেছে—সে সব সময় তার পাশে পাশে বয়েছে—এবং এই বন্ধু আর কেউ নয়—এ তার সেই অনাগত ক্লোকটা। আগের চেয়ে উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে সে, আরও স্থির সঙ্কল্প দেখা দেয় তার মনে—স্বপ্নটি আদর্শভূষিত মান্তবের মত। সন্দেহ এবং সংশয়তার ছায়া তার মুখ এবং তার চালচলন থেকে অপসারিত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আশ্বনের টুকরো তার চোখে জলে ঝুঁকতে দেখা যায়। মাথায় দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া চিন্তা ভেসে বেড়াতে থাকে। সে কি ওরকম জামা বানাতে পারে না? ওই চিন্তাটা তাকে বিমনা করে তোলে—একবার প্রায় তার লেখা তুলই করে ফেলেছিলো। কিন্তু, 'ওঃ' বলে সে নিজকে সামলে নেয় এবং ক্রুশ চিহ্ন আঁকে। মাসে অন্তত একবার সে পেট্রোভিচের সাথে দেখা করতো—তার নতুন ক্লোকটার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। স্ক্রিজেন্স ক'রতো, কোথায় সে কাপড় কিনবে, কি রকম রং হবে, কি রকম দাম সে দেবে, এবং একটু আগে হলেও সে সব সময়ই এই চিন্তা ক'রতে ক'রতে বাড়ীতে ফিরতো যে শীগগিরই একদিন সে কাপড় কিনে ক্লোক বানাতে দেবে।

অপ্রত্যাশিতভাবে দিন কেটে যাচ্ছিলো। আকাক্তিচের স্বপ্নাতীত-ভাবে মালিক বাট্ কবল দিয়েছিলো, তার অসুখমান অসুখায়ী চল্লিশ অথবা

পরিতাপিত নয়। লোকটা কি বলেছিলো যে তার একটা নতুন ক্লোক
 তরকারি, অথবা এটা শুধু ঘটনাচক্রের মিল? বাই হোক,
 আকাকিভিচের নিজের কাছে কুড়ি রুবল বেশি জমলো। এই
 ঘটনাটাই ব্যাপারটাকে এগিয়ে দিলো। আর দু'তিন মাস অধর্শন—
 তারপরেই ওর কাছে আশি রুবল জমবে। স্বভাবত শাস্ত্র জুগপিওটা
 তার তাড়াতাড়ি চপতে থাকে এবং পরদিনই সে পেট্রোভিচের
 দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তারা কতকগুলো ভালো কাপড়
 কেনে। ছয়মাস আগেই এটা ঠিক করেছিলো এবং প্রত্যেক মাসেই
 দাম সম্বন্ধে খোঁজ নিতো। পেট্রোভিচ নিজের বলে, যে এর চেয়ে
 ভালো কাপড় আর পাওয়া যাবে না। পেট্রোভিচের কথা অন্তর্দৃষ্টি
 তারা ভালো শক্ত সাটিন কেনে—যা রেশমের চেয়েও সুন্দর, দামী এবং
 চক্চকে। দাম বেশি বলে বেজীর চামড়ার কথাই উঠে না—এর
 বদলে বিড়ালের চামড়া পছন্দ করা হলো—দোকানের মধ্যে ওটাই
 সবচেয়ে ভালো। দূর থেকে ওটা ঠিক বেজীর চামড়া বলেই বোধ
 হয়। ক্লোকটা বানাতে পেট্রোভিচের দু'সপ্তাহ লাগে। অত বাঁধন
 না লাগলে তার খানিকটা কম সময় লাগতো। কুড়ি টাকা পারিশ্রমিক
 চাইলে সে। সে কম নিতে পারে না—কারণ সিল্কের সূতো দিয়ে
 দুসাব করে ওটা আগাগোড়া তৈরী। পেট্রোভিচ দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে
 ওকে নানা প্যাটার্ন করে।

সেদিন দিনটা মনে করা কষ্ট—কিন্তু আকাকিভিচের জীবনের সবচেয়ে
 আনন্দময় দিন—যেদিন পেট্রোভিচ শেষ পর্যন্ত তার জাগাটা বাড়ীতে
 নিয়ে আসে। তখন সময়ট' সকাল বেলা—আকাকিভিচ সাধারণত
 যখন আফিসে যায় তার একঘণ্টার একটু আগে। ওর চেয়ে উপযুক্ত
 সময় আর হতো না—কারণ, সেদিনই প্রবল তুষারপাত হয়, আর
 আবহাওয়া যে আরও ঠাণ্ডা হবে তার সব লক্ষণই ছিলো। পেট্রোভিচ

নিজেই ক্লোকটা নিয়ে আসে—ভাল দরজি যা' ক'রে থাকে। আকাকিভিচ তাকে আর কোনদিন এমন গাভীর্ষ অবলম্বন করতে দেখেনি। যে কাজ তাকে পুরোণো জামা মেয়ামত থেকে নতুন জামা বানানোর দবজিতে তাকে উন্নীত করেছে, সেদিন এ সম্বন্ধে বোধ হয় সে সম্পূর্ণ চৈতন্যশীল ছিলো। রুমালে জড়ানো ক্লোকটা সে রুমাল থেকে তুলে নিলে। ওটা (রুমালটা) সত্ত্ব কাচিরে আসার পর সে নিজের ব্যবহারের জন্ত পকেটে তুলে রেখেছিলো। ক্লোকটা তুলে নিয়ে গর্বোন্নত দৃষ্টিতে সে ওর দিকে চায়। তারপর দু'হাত দিয়ে ধরে ওটাকে দক্ষতার সাথে আকাকিভিচের কাঁধের উপর কেলে দেয়—পেছনের দিকে পাশি কবে দেয় ঘসে ঘসে এবং শেষে নিপুণভাবে আকাকিভিচের গায়ে ওটা পরিয়ে দেয়। বয়সের কথা চিন্তা করে আকাকিভিচ হাতায় হাত ঢুকিয়ে পরবার জন্ত চেষ্টা করতে থাকে। হাতায় হাত ঢুকাতে পেট্রোভিচ ওকে সাহায্য করে। নিজের হাতের কান্সের প্রাংসা করে পেট্রোভিচ দাম যে কম নিয়েছে একখাটা বলবার স্বযোগ ছাড়ে না—কারণস্বরূপ বলে যে, সে আকাকিভিচকে অনেকদিন ধরে জানে—তা ছাড়া সে একটা বাজে রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডহীন অবস্থায় বাস করে বলেই কম দাম নিয়েছে। নেভস্কী প্রম্পট্টের দরজি হ'লে কাজটার জন্তই শুধু পঁচাশি রুবল চার্জ করতো। ওকথা আলোচনা করার আকাকিভিচের ইচ্ছা ছিলো না। এমন কি অতগুলো টাকাও কখনো বা বলতে পেট্রোভিচ ভালোবাসতো তা একে আতঙ্কিত ক'রে তোলে। সে ওকে টাকা দিয়ে, দণ্ডবাদ জানিয়ে তার নতুন জামা পরে আকিসে রওনা হয়। পেট্রোভিচ তার পেছন পেছন যায়। জামাটার প্রাংসা করবার জন্ত রাস্তার ধামে, তারপর সতীর্ণ একটা গলি দিয়ে ছুটে রাস্তার অন্য পাশে যায় যাতে ক্লোকটার সামনের দিক থেকে দেখতে পায়। ইতিমধ্যে আকাকিভিচ প্রফুল্ল মনে অনেকটা এগিয়ে চলে। প্রতি

মুহূর্তে সে অশ্রুভব করছিলো যে তার কাঁধের ওপর নতুন ক্লোকটা আছে। মাঝে মাঝে অন্তরের আনন্দে হাসছিলো সে। ছোটো স্ববিধা এসেছে আমাটার সাথে—প্রথমত ওটা গরম, দ্বিতীয়ত ওটা পবাত্রে ওর মনে একটা তৃপ্তির ভাব দিচ্ছে। রাস্তার দিকে ন. তাকিয়েই সে আঁকিসে এসে পৌঁছয়। ক্লোকটা খুলে পরীক্ষা করে সে ভৃত্যের হাতে ওটা দেয়। ওকে সাবধান ক’রে দিয়ে বলে, ওটার উপর যেন বিশেষ নজর রাখে। স্বভাবতই অকিসের সকলে আকাকিভিচের নতুন ক্লোকের কথা, এবং পুরানো ভ্রে সিং গাউনটার অন্তর্ধান হবার কথা শোনে, এবং প্রত্যেকেই হলে ছুটে আসে ওটাকে দেখবার জন্য। সকলেই প্রশংসা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ জানায়। প্রথমটা আকাকিভিচ্ একটু হাসে। পরে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং যখন সকলে জিদ ধরে যে এই উপলক্ষ্যে উৎসব করবার জন্ত তাকে একটা পার্টি দিতে হবে, তখন আকাকিভিচের মাথা ঘুরে যায় একেবারে এবং বুঝতে পারে না সে কি বলবে এবং কি করে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করবে। মুখটা তার লাল হয়ে উঠে এবং বলতে উদ্যত হয় সে যে ওটা আদৌ নতুন ক্লোক নয়, ওটা কিছু দিন আগেও,—তখন ওদের মধ্যে একজন, বড়কর্তার সহকারী, সে যে ক’তে বাবু নয় এটা দেখবার জন্ত বলেন, “আচ্ছা, বেশ, দেখুন, আজ রাতে আমি আর আকাকিভিচ্ একটা পার্টি দেবো। আমার বাড়ীতে চা খেতে আসুন বন আপনারা সবাই, আজ আমার বাড়ীতে একটা পর্বও আছে।”

অগ্ন্যান্য কেরাণীরা তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধন্যবাদ জানায় এবং সহজেই তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। আকাকিভিচ্ প্রত্যাখ্যান ক’রতে উদ্যত হয়—কিন্তু ওরা বলে যে, ওটা অসত্যতা এবং নিলজ্জতা এবং গুরুত্ব কিছু হবে। সুতরাং অন্য কোন উপায় না থাকতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক’রতে হয়। শীগগিরই সে একটু আরাম বোধ করে যে সে তার ক্লোকটা সন্ধ্যোরেলা পড়তে পারবে। দিনটা আকাকিভিচের কাছে

স্বরণীয়। উৎফুল্ল মনে সে বাড়ীতে আসে, জামাটা খুলে সে সাবধানে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। আর একবার ওর কাপড় এবং সেলাই পরীক্ষা করে দেখে। পুরোনো ক্লোকটা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখে দৃষ্টান্তে —না হেসে সে থাকতে পারে না—পার্থক্যটা এতই বেশি! হৃপ্পরে খাবার সময়ও সে মাঝে মাঝে ড্রেসিং গাউনের অবস্থাটা মনে করে হাসে। ষাওয়া শেষ হ'লে সে কাগজপত্র নকল করতে না বসে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বিছানায় শুয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে সে ক্লোকটা পড়ে রাত্তায় নেমে আসে।প্রথমটায় সে কতকগুলো অঙ্ককার আর নির্জন রাস্তা ধরে চলে, কিন্তু সেই কেরাণী তত্ত্বলোকের বাড়ী এগিয়ে আসার সাথে সাথে রাস্তাগুলো উজ্জল এবং সজীব হ'য়ে উঠে। অনেক লোক চলচে রাস্তায়—তাদের মধ্যে সুন্দর হাল ফ্যাসানের পোশাক পরা মেয়ে এবং লোমওয়ালা কলারতোলা জামাপরা অনেক তত্ত্বলোক রয়েছে। একজনও ওহা লোক নেই আসে পাশে। লাল মখমলের টুপি পরা স্মার্ট ড্রাইভার তালুকের কবলে গায়ে গা ঢেকে রংকরা গ্লেক্স নিয়ে ছুটছে বরফের উপর দিয়ে। চাকার কড় কড় শব্দ—সুন্দর গাড়ীর বসবার আসনগুলি। আকাক্ষিত্তি সব জিনিসের দিকে অবাক বিশ্বাসে চেয়ে থাকে। অনেক বছর ধরে সে রাতে বাড়ীর বের হয়নি।

অবশেষে সে সেই বাড়ীতে এসে পৌছয়। কেরাণীটি বেশ জাকজমকের সাথেই থাকেন। সিঁড়ির উপর একটা আলো ছিল। স্মার্টটা দোতালায়। স্বরে ঢুকতেই সারি সারি চটির সম্মুখীন হয় আকাক্ষিত্তি। তাদের মধ্যে মেঝের মাঝখানটায় সানোতার (একরকম পানীয়) টগবগ করে কটছিল। পাশের ঘর থেকে মিলিত স্বরে চীৎকার উঠছে। দরজা খোলার সাথে সাথে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একজন ভৃত্য একটা ট্রে ভর্তি খালি গ্লাস নিয়ে বাইরে বেরোয়। নিমন্ত্রিতের দল তা হলে স্পষ্টই এসেছে, এবং প্রথম কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। জামাটা ঝুলিয়ে

রেখে আকাঙ্ক্ষিত ঘবে ঢোকে। মাড়য, চুকটের পাইপ, মোমবাতি, তামগেলার টেবিল তার চোখে ঝলমল ক'রে উঠে, এবং চারিদিকের চীৎকার আর চেয়ার টানার শব্দে তার কানে তাল লেগে যায়। কি ক'রবে ঠিক না পেয়ে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘরের মাঝখানে থেমে যায়—কিন্তু দলের নজরে তখন সে পড়ে গেছে। বৈচিত্র্যের তাকে সম্বন্ধ না করা হয়—প্রত্যেকে হলে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার ক্লোকটাকে দেখতে থাকে। তাসের টেবিলের অপেক্ষাকৃত বেশি আকর্ষণে শীগগিরই ওর এবং ওর ক্লোকের কথা সবাই ভুলে যায়। 'ওই গোলমাল, ওই জনতা, ওই কথাবার্ত' সব ওর কাছে অপূর্ব মনে হয়। তার হাত, তার পা, সাধারণ ভাবে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বটাকে নিয়ে, সে কি কববে বুঝে ওঠে না। তাসের টেবিলে গিয়ে সে বসে, তাস আর খেলোয়ারদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, এবং শীগগিরই হাট তুলতে আঁবস্ত করে। অবসাদ বোধ করতে থাকে সে, কারণ অন্যান্য দিন বহুক্ষণ আগেই সে শুয়ে পড়ে। গৃহকর্তার কাছ থেকে সে বিদায় নিতে চেয়েছিলো, কিন্তু অন্যান্যরা তাকে যেতে দেবে না, তারা বলে নতুন ক্লোকের উদ্দেশ্যে তারা শ্যাম্পেন পান না করে ছাড়বে না। এক ঘণ্টা বাদে খাবার দেওয়া হয়—ঠাণ্ডা তেড়ার মাংস, পিঠে, শ্যাম্পেন। আকাঙ্ক্ষিত দু'গ্লাস টানতে বাধ্য হয়। এর পরে ঘরের সব কিছুই উজ্জল বলে বোধ হতে আরম্ভ করে। তবু সে ভুলে নি যে, রাত বারোটা বেজে গেছে, এবং অনেক আগেই তার বাড়ী ফেরা উচিত ছিলো। গৃহস্থানী তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে এই আশঙ্কায় সে নিঃশব্দে ঘর থেকে সরে পড়ে এবং তার ক্লোকের খোঁজ করতে যায়—দুর্ভাগ্যক্রমে সেটাকে মাটিতে পড়ে থাকতে সে দেখলে। সেটাকে ঝেড়ে প্রতিটি ধুলোর কথা ফেলে দিয়ে সে ওটা গায়ে দেয় এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। বাইরে তখনও আলো ছিলো। ছোট ছোট দু'একটা দোকান তখনও খোলা ছিলো—সেগুলো যত সব ছোট-

লোকের আড্ডা। যেগুলো বন্ধ ছিলো সেগুলো থেকেও আলো বেড়িয়ে আসছিলো। সেখানে চাকর এবং চাকরাণীরা নিঃশব্দেই তাদের প্রভু অথবা কর্তীদের আলোচনায় বাস্তব ছিলো—এদের স্থান বাস সবকিছু প্রকৃতি অজ্ঞ ছিলেন। বেশ প্রফুল্ল মনে আকাকিভিচ এগিয়ে চলে। সে তাড়াতাড়ি ছুটতে যাবে এমন সময় হঠাৎ একজন মেয়েলোক কোথা থেকে এসে ধাক্কা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। ওর শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হঠাৎ সজীব বলে মনে হয়। আকাকিভিচ থেমে যায়, তারপর ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকে—ভেবে অবাক বোধ করে যে কি করে সে এত দ্রুত চলেছিলো। শীগগিরই সে নির্জন বাসস্থানগুলোর কাছে পৌছয়—যেগুলো দিনের বেলায়ও জনশূণ্য থাকে। আরও অন্ধকার এবং নির্জন বলে মনে হয় গুল্লোকে। রাস্তার আলো বহু দূরে দূরে দু'একটা করে। তেল স্পষ্টই নিঃশেষে পড়ে গেছে। কাঠের ঘরগুলো এবং বেড়া দেখা যায়—কিন্তু জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। মাটির ওপর বরফগুলো অন্ধকার নিম্ন ছোট ঘরগুলোর শান্তির ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চক্‌চক্‌ করছিলো শুধু। বড় একটা পার্কের সামনে সে এসে উপস্থিত হয়—পার্কের ওখারের বাড়ীগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছিলো। স্থানটা ভয়ঙ্কর নির্জন এবং জনশূণ্য। দূরে সেন্ট্রী বক্সের (পাহাড়াওয়ালার ঘর) মধ্যে একটা আলো জ্বল জ্বল করছিলো—মনে হচ্ছিলো যেন দূরে বহুদূরে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে ওটা। আকাকিভিচের সাহস কমে আসে। আশঙ্কিত চিন্তে সে পার্কট' পাড়ি দিতে থাকে—মনের মধ্যে কেমন একটা বিপদের আভাস জেগে ওঠে। তার দৃষ্টি আশেপাশে ঘুরতে থাকে—যেন মহাসাগরের মধ্যে পড়েছে সে। “নাঃ, চোখ বন্ধ করে রাখাই ভালো”, সে জাবে এবং চোখ বুজে হাঁটতে থাকে। পার্কের অপর পার্কে এসেছে কিনা দেখবার জন্য যখন সে চোখ খুলে তখন দেখতে পায় যে সে একজন গৌরবোন্মী লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট তাকে দেখা যায়

না—চোপের সামনে যেন কুয়াসা তেলে ওঠে—বুক আকাকিভিচের ধক ধক করতে থাকে।

“ক্লোকটা আমার!”—বজ্রের মত গভীর স্বরে সে বলে এবং ওর কলার চেপে ধরে। আকাকিভিচ সাহায্যের চীৎকার করতে গিয়ে যেমনি মুখ খুলতে যাবে অমনি প্রকাণ্ড একটা ঘুসি এসে সেখানে পড়ে। একজন ভয় দেখিয়ে তখন বলে “এতো সাহস তোমার।”

আকাকিভিচ বোঝে যে ক্লোকটা তার খুলে নেওয়া হচ্ছে—তারপর একটা লাথি পেয়ে পেছনে বরফের মধ্যে সে ছিটকে পড়ে, তারপরতারপর সে আর কিছু জানে না। কয়েক মিনিট বাদে জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেগে, কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে তার শরীর এবং ক্লোকটাও উধাও হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সে সাহায্যের জন্যে খুব জোরে জোরে চীৎকার করতে থাকে—কিন্তু তার স্বর এত জোর হচ্ছিলো না যাতে পার্কের আর এক প্রান্ত থেকে শোনা যেতে পারে। বেপরোয়া হয়ে এবং উদ্বুদ্ধভাবে চীৎকার করতে করতে সে পার্কের ভেতর দিয়ে সোজা সেন্ট্রী বজ্রের দিকে ছোট্ট—সেখানে একজন পুলিশ বন্দকের উপর ভর দিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলো কোন হস্তভাগা ওর দিকে ছুটে আসছে! আকাকিভিচ ওর দিকে ছুটে যায় এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ওকে গাল দিতে থাকে যে ও ডিউটী না করে সেন্ট্রী বজ্রের ভেতর ঘুমাচ্ছে। পাহারা-ওয়ালারা বলে যে হুঁ জন লোক শুধু ওকে পার্কের মধ্যে থামিয়েছিলো, কিন্তু ওর বন্ধু ভেবে সে আর মজুর দেয়নি। সে বলে যে ওকে শুধু শুধু না বকে যেন ও কাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে যায়—সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্লোকটা বের করতে ওকে সাহায্য করতে পারেন। শৌচনীয় অবস্থায় আকাকিভিচ বাড়ী পৌছয়। তার চুল—যেটুকুও মাথা আর ঘাড়ের দিকে ছিলো—আলুখালু হয়ে গিয়েছিলো, আর কাপড় হয়েছিল বরফে মাখানো।

জোরে জোরে খান্না দিলে গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে হড়োহড়িতে এক পাটি স্লিপার ফেলেই এবং কুণ্ঠিতভাবে নাইট ড্রেসটা বৃকের শপব খবেই দোব খুলে দিতে আসে। আকাকিতিচকে দেখে আতঙ্কে সে এক পা পিছিয়ে যায়। ঘটনাটা তাকে বোঝালে সে হাত ছুঁড়ে ওর পরিচিত একজন ইন্সপেক্টরের কাছে ওকে যেতে উপদেশ দেয় - সেন্ট্রীবিশ্বের সেই পাহারাওয়ালারা সম্ভবত কিছুই করবে না। তার পূর্বতন পাচিকা অ্যানা এখন ওই ইন্সপেক্টরের পরিবারের নাস। বাড়ীটির পাশ দিয়ে যাবার সময় সে প্রায়ই ওকে দেখে থাকে— প্রতি ববিবারে চার্চেও ওকে দেখতে পায়। প্রার্থনা বলবার সময় তিনি সকলের উপরই সদয় দৃষ্টি বুলিয়ে থাকেন, এবং নিশ্চয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক তিনি। ওর কাছ থেকে সমস্যার মীমাংসার উপায় শুনে আকাকিতিচ বিমর্ষভাবে নিজের ঘরে যায়। শুধু যারা পরের দুঃখ বুঝতে পারে তারাই বুঝতে পারবে কি ভাবে ওর রাতটা কাটে। পরদিন ভোরে উঠেই সে ইন্সপেক্টরের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়, এবং গিয়ে শুনে পায়, তিনি তখনও শুয়ে। এগাবোটার সময় আবার সেখানে গিয়ে শোনে যে তিনি বাড়ীতে নেই। দুপুরের খাবাবেব সময় ফের সে যায়, কিন্তু কি জগ্গে সে এসেছে তা না জেনে কেরাণীবা তাকে ঢুকতে দেবে না। শেষে তার ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে যায়—আকাকিতিচ স্থিৰভাবে নিজের কথা ব্যক্ত করে এবং জীবনে সর্বপ্রথম তীব্রভাবে বলতে থাকে যে সে নিজেই ইন্সপেক্টরের সাথে দেখা করতে চায়—গবর্ণমেন্টের কোন কাজের জন্মই সে কোন ‘ডিপার্টমেন্ট’ থেকে এসেছে এবং তাকে ঢুকতে নিষেধ করা চলবে না, এবং যে তার কাজে বাধা দেবে তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে, এবং এইরকম মর্মে সব কথাবার্তা সে বলে। এ কথার উপর কেরাণীদেব বলবার আর কোন কথা থাকে না, এবং তাদের একজন ইন্সপেক্টরের কাছে যায়। ইন্সপেক্টর সজ্জিতভাবে ক্লোক চুরির গল্পটা শোনেন। ঘটনাটার

আসল বিষয়টার উপর মনোযোগ না দিয়ে তিনি আকাক্ষিতিকে নানা রকম প্রশ্ন করেন—কেন সে অত দেরীতে বাড়ী করেছিলো? সে কি কোন খারাপ জায়গায় গিয়েছিলো? আকাক্ষিতি এমন বিব্রত হয়ে পড়ে যে, সে তার ক্লকের ব্যাপারটা বলেছে কি বলে নি, এটা ঠিক না করেই সেদিন বিদায় নিয়ে নেয়। জীবনে সর্বপ্রথম সে আফিস যায় না। পরদিন পুরোনো ক্লোকটা পরে সাদা ভূতের মত বেশে সে আফিসে যায়—ওটা আগের চেয়ে আরও শোচনীয় এবং পুরোনো দেখায়।

ক্লোক চুরির ব্যাপারটা তার সহকর্মী বন্ধুদের প্রায় সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে—যদিও এ ব্যাপারেও রসিকতা করবার মত ছুঁ একজনের অভাব ছিলো না। নতুন একটা ক্লকের জন্ত চাঁদা ওঠানো হবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু চাঁদা যা ওঠে তা সামান্যই, কারণ, কেরাণীদের পকেটেব ওপর অনেক দাবী ছিলো। ডিরেক্টরের ছবির জন্ত চাঁদা দিতে হবে, এবং ডিরেক্টরের এক বন্ধু একখানা বই লিখেছে তার জন্যও চাঁদা—এবং এই রকম আরও আরও। একজন লোক দয়াপরবশ হ'য়ে আকাক্ষিতিকে খুব ভালো একটা উপদেশ দেবে ব'লে ঠিক ক'রলে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে তাকে যেতে একেবারে নিষেধ করে দিলে কারণ শুধু ডিপার্টমেন্টকে সন্তুষ্ট করবার জন্ত যদি পুলিশ জামাটা খুঁজে বের করেও, তা হ'লেও ওটা যে তার এমন অকাটা কোন প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত সে দাবী ক'রতে পারবে না ওটাকে। তার বদলে সে ওকে কোন একজন বড়লোকের কাছে আবেদন জানাতে উপদেশ দিলে—যিনি ঠিক মত জায়গায় লিখবেন অথবা দেখা করে ব্যাপারটাকে তাড়াতাড়ি ক'রতে বলবেন। অন্য কোন উপায় না দেখে আকাক্ষিতি তাঁর কাছে যাওয়াই ঠিক করলে। তিনি কে এবং তাঁর পদমর্যাদা কেমন আজ পর্যন্তও এটা রহস্যবৃত্ত হ'য়ে আছে; কিন্তু এটা বলতেই হবে যে ওই বিশিষ্ট লোকটি সম্প্রতিই শুধু বিশিষ্ট হ'য়েছেন, আগে তিনি

নগরপাই ছিলেন। যা হোক অল্প বড়লোকের সাথে তুলনায় আজও তাঁর প্রতিষ্ঠা অত বেশি নয়; কিন্তু কোন কোন লোক মনে করে, অন্যের চোখে বড় মনে হ'লেই বড় হ'লো। তাছাড়া, এই বিশেষ ব্যক্তিটি নানারকম ভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করেন—যেমন, আফিসে এলে তাঁর নিয়মদৃষ্টির সিঁড়ির ওপর তাঁকে সেলাম ঠুকতে হয়, অথবা, সোজা তাঁর কাছে কোন রিপোর্ট দাখিল করার হুকুম নেই; তাঁর কাছে রিপোর্ট পৌছাবার আগ পর্যন্ত কঠিন সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন ক'রতে হয়। কলেজিয়েট রেজিষ্ট্রারকে ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীর কাছে রিপোর্ট ক'রতে হয়, ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীকে টাইটুলার সেক্রেটারীর কাছে সেটা পেশ ক'রতে হয়, এবং ঠিকভাবে তাঁর কাছে পৌছানোর আগ পর্যন্ত অনেকবার এমনিভাবে চলে। এইভাবে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি রাশিয়ায় আজকাল অশ্রুধরনের ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রত্যেক নিয়মদৃষ্টি ব্যক্তি তার বড় সাহেবকে অশ্রুধর করে এবং তাঁর কার্যাবলী অশ্রুধর করে।

শোনা যায়, একজন টাইটুলার কাউন্সিলর পদোন্নতি হওয়ার কলে একটা ছোট বিভাগের কর্তা হন, তিনি অবিলম্বে তাঁর ঘরের একটা অংশ নিজের জন্য পার্টিসন ক'রে নিয়ে “দর্শকদের কক্ষ” নাম দেন। দুজন দারোয়ান উদ্দি পরে সেখানে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং কেউ ওই ঘরে ঢুকতে চাইলে—ঘরটা অবশ্য এতটুকু যে একখানা সাধারণ লিখবার ‘ডেস্ক’ও আঁটে কি না সন্দেহ—তারা তাকে সেখানে ঢুকাতো। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির আইন-কানুন এমনি রকম আড়ম্বরপূর্ণ—যদিও বলা চলে খানিকটা জটিল। মোটের উপর কঠোরতা হচ্ছে তাঁর ব্যবহার চাষিকাঠি।

—“কঠোরতা, কঠোরতা, কঠোরতা”—কোন লোককে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলার আগে, তার মুখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে তিনি প্রথমেই এই কথা বলতেন—যদিও বাস্তবিকপক্ষে কঠোরতা বা কড়াকড়ির

প্রয়োজন খুব কমই ছিলো—তার অফিস ষ্টাফের জনসংখ্যক কেরানী অহিনিশি তটস্থ অবস্থায় থাকতো, এবং দূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেলেই কাজ ফেলে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতো—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি খরের মাঝ দিয়ে চলে যেতেন ততক্ষণ তারা বসতোনা। অধস্তন কর্মচারীদের সাথে তার দৈনিক কথাবার্তার সময় একটা রুশ কঠিন আবহাওয়া বিরাজ করতো—এবং সাধারণত তিনটে কথাই তিনি প্রয়োগ করতেন—কেমন করে সাহস ক'রছো? জান, কার সাথে কথা ব'লছো তুমি! বুঝছো, তোমার সামনে কে? অন্তরে তিনি সদাশয় লোক ছিলেন, বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলজনক কোন কাজ সব সময়ই করতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু জেনারেলের পদবী তাঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। একই স্তরের লোকের ভেতর তিনি বেশ অমায়িক ও বুদ্ধিমান, কিন্তু তার স্তর থেকে এক ধাপ নিচু স্তরের কোনও দলে তিনি একটা কথাও ব'লতেন না এবং তার আচরণ অসম্মত হয়ে উঠতো। তাঁর অবস্থা দুঃখই জাগিয়ে তোলে—বিশেষত তিনি যখন বুঝতেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে বেশ আনন্দ পেতে পারেন (অবশ্য উক্ত দলে)। কোনরকম মজার কথাবার্তায় অথবা কোন আড্ডায় যোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা মাঝে মাঝে তাঁর চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠতো, কিন্তু তাঁর মর্যাদার হানি হবার চিন্তা তাঁকে অটল ভাবে সংযত ক'রতো—ফলে তিনি চিরকাল নীরব হ'য়ে থাকতেন, কখনও কখনও দু একটা ছোট কথা উচ্চারণ ক'রতেন। এইভাবে তিনি লোকের কাছে বিরক্তিকর ব্যক্তিরূপেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এইরকম একজন বড়লোকের কাছে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত এক অন্তত এবং অহুবিধাজনক মুহুর্তে এসে হাজির হ'লো। বড়লোকটি শুধুমাত্র তাঁর প্রাইভেট রুমে তাঁর একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে গল্প ক'রছিলেন। বন্ধুটি সবেমাত্র গ্রাম থেকে এসেছেন এবং তাঁকে

তিনি বহুকাল দেখেন নি—এই সময় একজন বাণবাচ্‌কিনের অঙ্গমনের কথা ঘোষণা করা হলো।

—“কে সে?”—তিনি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন।

—“একজন সিতিল সাতিলের কেরাণী”—উত্তর এলো।

—“ও, তাকে অপেক্ষা করতে বল। এরকম সময় আমি লোকজনের সাথে দেখা করি না।”

এখন এটা বলা দরকার যে বড়লোকটি মিছে কথা বললেন। এই সময়েই তিনি লোকজনের সাথে দেখা করেন। বন্ধুকে বলার কল্যাণে তিনি অনেক আগেই শেষ করেছেন.. এখন তার বন্ধুকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে পাণের ঘরে একজন লোককে বসিয়ে রাখার ক্ষমতা তার আছে। অবশেষে আরও অনেক কথাবার্তার পর আরামদায়ক আর্ম-চেয়ারে বসে চুরুটটা শেষ কবে তিনি তাঁব সেক্রেটারীকে বললেন,—
যে সেক্রেটারী কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে এসে কতকক্ষণ অপেক্ষা করছিলো—

—“একজন কেরাণী অপেক্ষা করছে মনে হয়। তাকে আসতে বল।”

—নিরীহ আকাকিতিচ এবং তার পুরোণো পোষাক দেখে তিনি ওর দিকে একেবারে ঘুরে জিজ্ঞাসা করলেন—“কি কাজ তোমার?” রক্ষকঠোর তাঁর গলার স্বর—ওটা তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হয়ে বর্তমান পদে অধিষ্ঠিত হবার এক হুঁপা আগে বাড়ীতে নিজের প্রাইভেট রুমে একটা আয়নার সামনে অভ্যাস করেছিলেন। তীক্ষ্ণ আকাকিতিচ আরও ঘাবড়ে গেল। তার জিতের ক্ষমতাহুমায়ী সে বললে যে, তার একটা নতুন ক্লোক রাহাজানি করে নেওয়া হয়েছে। সে এই আশা নিয়ে এসেছে যে জেনারেল তার জন্যে কিছু করবেন—পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অথবা অন্য কারও কাছে লিখে প্রয়োজনীয়সারে চেষ্টা করে

ভায় ক্লেকটা উদ্ধার করে দেবেন। জেনারেল কোন কারণে তার আচরণকে অমর্যাদাজনক বলে মনে কবলেন।

—“মশায়,” তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, “এ ব্যাপারে সাধারণ রীতিও কি জানেন না? আমার কাছে সোজা এসেছেন কেন? আপনার এই বিভাগে একটা দরখাস্ত করা উচিত ছিলো; সেই দরখাস্ত প্রথমে হেড ক্লার্কের কাছে, তারপরে এই বিভাগের বড় সাহেবের কাছে, তারপরে আমার সেক্রেটারির কাছে এবং শেষে আমার কাছে আসবে”।

—“কিন্তু, মহামুভব”, যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিলো সেটুকু সঞ্চয় করে আকাক্ষিত্ব বলে, “আমি স্বচ্ছায় আপনার কাছেই সোজা এসেছি— কারণ, সেক্রেটারীরা ওরকম অপদার্থ সব লোক.....”

—“কি, কি, কি?” তিনি জানতে চাইলেন। “এই মনোভাব নিয়ে আপনি এসেছেন? এরকম ধারণা কোথেকে জোগাড় করলেন? এইভাবে কি আপনারা—যুবকরা—বয়োজ্যেষ্ঠদেব এবং উৎকৃষ্ট লোকদের দেখেন?”

উনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা সন্দেহ যে আকাক্ষিত্বের বয়স পঞ্চাশের ওপর এবং আশি বছর বয়সের লোকের তুলনায়ই ওকে যুবক বলা যেতে পারে।

—“জানেন কার সাথে কথা বলছেন? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কে জানেন? জানেন কি, আমি জিজ্ঞাসা করি।”

এই সময়ে তিনি রাগে পা ছুঁড়তে থাকেন এবং এমন সপ্তম্নে তাঁর গলার খর চড়ান যে আকাক্ষিত্বের চেয়ে একটু কম সাহসী লোক হলেও ভয়ে কাঁপতে থাকতো। আকাক্ষিত্ব কিন্তু একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে— তার শরীরটা সামনে এবং পিছনে ছলতে থাকে। একজন আদালি ধরে না ফেললে সে মেঝের ওপর পড়েই যেতো। অচেতন অবস্থায় আকাক্ষিত্বকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহৎ ব্যক্তিটি তাঁর কাজের ফল দেখে সন্তুষ্ট হয়ে

এবং যা তার চরম প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একটা কথায় যে একটা লোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—এই চিন্তায় যাতাল হয়ে তার বন্ধুর মূখের দিকে চাইলেন—উদ্দেশ্য যে তার বন্ধু এই দৃশ্য কেমন উপভোগ করলেন লক্ষ্য কর। তিনি অবশ্য লক্ষ্য করলেন, এবং একটু আনন্দের সাথেই যে, তাঁর বন্ধুও তাঁকে প্রায় ভয় করছেন বলে মনে হচ্ছে।

আকাকিভিচ মনে করতে পারে না কি করে সে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলো। তার হাতপায়ে কোনো বোধশক্তি ছিলো না। কোন জেনারেলের কাছ থেকে জীবনে সে এমনি ভাবে তিরস্কৃত হয় নি, —এবং এরকম একজন অদ্ভুত রকম জেনারেল !! সে ছ ছ কথা বাতাসের মাঝ দিয়ে হা করে তার পথ এগোবার চেষ্টা করছিলো। সেন্ট পিটার্সবার্গের পথে সাধারণত বাতাস সব দিক দিয়ে আসতে থাকে, সব রাস্তা সব গলি দিয়ে তীব্রতমভাবে ওগুলো ছুটে আসে। ভরসিক ঠাণ্ডা লেগে আকাকিভিচের গলা ফুলে উঠে জ্বলতে থাকে, এবং বাড়ী পৌছনর পর তার গলা দিয়ে রা-ও বেরোয় না। সোজা বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়ে। তিরস্কার কখনও কখনও এমনই ভয়ঙ্কর ফল ফলিয়ে দেয়! পরদিন তার সন্ধানক জ্বর হয়। সেন্টপিটার্সবার্গের আবহাওয়ার কল্যাণে রোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত বেড়ে যায়। ডাক্তার এসে নাড়ো দেখার পর করবার আর কিছুই থাকে না। স্ত্রীরাঃ তিনি সেক দিতে বলেন—উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, যাতে কেউ না বলে যে রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ওসব সম্বন্ধে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার তার অবস্থা নিরাশ বলে প্রকাশ করেন, এবং গৃহকর্তাদের দিকে ফিরে বলেন, আপনি বরং যত শীগগির সম্ভব একটা পাইন কাঠের কফিন আনতে বলুন, ওকের কফিন গুর অবস্থায় কুলোবে না।”

এই সব ভয়ঙ্কর কথা কি আকাকিভিচ শুনতে পেয়েছিলো ? শুনলে তাঁর মর্মের অবস্থা কি হতো ? তার হতভাগ্য জীবনের জন্য কি সে অশ্রুতাপ করতো ? কেউই বলতে পারে না, কারণ আকাকিভিচ তখন ভুল বকছিলো। তার চোখের সামনে প্রেতছায়া ক্রমেই ভয়ঙ্কর মৃত্তিতে হুটে উঠছিলো। কখনও সে দেখছিলো পেট্রোভিচকে—তার কাছে সে অর্ডার দিচ্ছিলো একটা ক্লোকের...ক্লোকের মধ্যে চোরের স্তম্ভ কতকগুলো অদ্ভুত ফাঁদ থাকবে! চোরগুলো যেন বিছানার নিচে রয়েছে। আকাকিভিচ চীৎকার করে এসে গৃহকর্ত্রীকে বিছানার চাদরের মধ্য থেকেই একটা চোরকে টেনে বের করতে বলছিলো। কখনও সে জিজ্ঞাসা করছিলো তার নতুন ক্লোকটা থাকতে কেন পুরোনো ক্লোকটা ওখানে ঝুলছে। কখনও সে কল্পনা করছিলো যে সে সেই জেনারেলের সামনে থেকে তার গালি শুনছে, বিড় বিড় ক'রে বলছিলো সে, “আমি দুঃখিত, ধর্মাবতার!” এবং পরে এমন সব শপথ ক'রছিলো যাতে সেই বৃড়ী গৃহকর্ত্রীকে তাড়াতাড়ি জুশ্ আঁকতে হচ্ছিলো। আকাকিভিচকে ও রকম ভাষা প্রয়োগ করতে সে কোনদিন শোনে নি—বিশেষ করে “মহান্নভব” ইত্যাদি কথা। পরে যে সব কথা সে বলছিলো তার কোন অর্থই হয় না—শুধু এটুকু স্বম্পষ্ট হয়েছিলো যে, তার প্রলাপ ‘ক্লোক’কে কেন্দ্র ক’রেই চ’লছিলো। শীগ্গিরই হতভাগ্য আকাকিভিচের শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। তার ঘর কিংবা জিনিসপত্র কোন কিছুই ব্যবস্থা করা ছিলো না—কারণ, প্রথমত তার কোনই উত্তরাধিকারী ছিলো না, দ্বিতীয়ত রেখে খাবার মত জিনিস তার সামান্যই ছিলো। এই সমস্ত জিনিস নিয়েই তার সম্পত্তি—এক বাণ্ডুল কলম, এক দিস্তা গবর্ণমেন্ট কাগজ, তিনজোড়া মোজা, তার ট্রাউজারের দুটো তিনটে বোতাম এবং সেই পরিচিত ড্রেসিংগাউন। ভগবান জানেন কে সে সবার উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। স্বীকার করবো:

যে, আমাকে যিনি গল্পটা ব'লেছিলেন ও প্রাণে তাঁর কোন কৌতুহল ছিলো না। আকাকিভিচকে কবর দেওয়া হলো। সেন্টপিটার্সবার্গ আকাকিভিচ-শূন্য হয়ে পড়লো—যেন কোনদিনই তার অস্তিত্ব ছিলো না। এইভাবে একটা জীব অবাহিত ও অনাদৃত অবস্থায় বিদায় নিয়ে গেলো। একজন প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞের কৌতুহলও সে জাগিয়ে তুলতে পারে নি—সাধারণ একটা মাছির ব্যবচ্ছেদেও ওরা এর চেয়ে বেশী কৌতুহল পোষণ করে থাকে। এমন একটি জীব সে, যে বিনীতভাবে তার সহকর্মীদের ঠাট্টা বিক্রপের কাছে নতি স্বীকার ক'রেছিলো—এবং জীবনের শেষ অবধি যার কাছে কোন রকমের গুরুতর ঘটনাই ঘটে নি—ওধু শেষে, সামান্য একটু সময়ের জ্ঞান, একটা ক্লোকেস আশ্বাদে তার জীবনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো—এবং ক্লোকটা তার জীবনে এমন একটা বিরাট বিপর্যয় এনে দিলো যে, তাতে মনে হলো সে যেন পৃথিবীর বিরাট ব্যক্তিদেরই একজন।

চারদিন পরে অফিস থেকে একজন পিওন এসে হাজির। সে বললে, কর্তা তাকে বার বার করে কাজে যোগ দিতে বলেছেন, কিন্তু পিওন আকাকিভিচ ছাড়াই চলে গেলো, এবং ফিরে গিয়ে বললো, “তিনি আর কোনদিন আসবেন না”।

“কেন?” প্রশ্ন ক'রলে, সহজভাবে সে উত্তর দিলো—“কারণ, তিনি মারা গেছেন, চারদিন আগে তাঁর কবর দেওয়া হ'য়ে গেছে।”

এইভাবে আকাকিভিচের মৃত্যু সংবাদ অফিসে পৌঁছয়। পরদিন একজন নতুন কেরাণী তার জায়গায় বসে। লোকটা আকাকিভিচ থেকে লম্বা; তার লেখা ওর মত সোজা অথবা নির্দোষ নয়—হেলান এবং বাঁকা-টানরা।

কে বিশ্বাস ক'রতে চাইবে যে এই আকাকিভিচের শেষ নয়, এবং তার ছাত্রাময় বর্ণহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ করবার জ্ঞান সে মৃত্যুর পর

করুকমিনের জন্ত খ্যাতি অর্জন ক'রবে ! কিন্তু সেটা সত্যিই ঘটেছিলো, এবং আমাদের সামান্য গল্পটা তাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা অদ্ভুত পরিণতি লাভ করল। সায়! সেন্টপিটার্সবার্গে হঠাৎ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কালিঙ্কিন ত্রিজ এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে সিভিল সার্ভিস কেরাণীর বেশে একটা ভূত রাত্রে একটা অপহৃত ক্লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই অছিলায় সে যে কোন পথিকের কাঁধ থেকে 'ক্লোক' ছিনিয়ে নেয়—তা' সে যে কোন পদবী বা মর্যাদার লোকই হ'ক না কেন। একজন কেরাণী স্বচক্ষে সেই ভূতটাকে দেখেছে এবং আকাক্ষিচকে সে চিন্তে পেরেছে। এত ভয় হয়েছিলো তার যে সে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে পালিয়েছে—ফলে, ভূতটাকে সে ভালো ক'রে দেখতে পায় নি। দূর থেকে শুধু দেখেছে যে ভূতটা তার দিকে আশঙ্কাজনকভাবে তর্জনী নাড়াছিলো। অসংখ্য অভিযোগ চারিদিক থেকে আসতে থাকে—শুধু টাইটুলার কাউন্সিলারদের কাছ থেকেই আসে না—ভূতের জন্ত যাদের কাঁধ খালি হ'য়ে গিয়েছিলো, তাদের কাছ থেকেও আসে। পুলিশ তাকে যে কোন ভাবে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরবে বলে শাস্বাস্ত করে, এবং তাকে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হবে যাতে সেটা অস্ত্রের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ'য়ে থাকে। তারা প্রায় কৃতকার্ণ হ'য়েছিলো। কিরুম্কিন্‌স্ট্রেটে একটা কনষ্টেবল্‌ অপরাধে লিপ্ত অবস্থায় ভূতটার কলার ধরে ফেলল—যেমন সে আগে বৃদ্ধ গায়ক এবং স্কুটপ্লেয়ার'দের কাঁধ থেকে ক্লোক ছিনিয়ে নিতো। কনষ্টেবলের চীৎকারে আরও দুজন কনষ্টেবল্‌ এসে পড়ে। সে তাদের বন্দী ভূতটাকে ধরতে ব'লে ঠাওয়া জমে যাওয়া নাকটাকে চাপা ক'রে তুলবার জন্ত বুটের ভেতর থেকে নশ্টির কৌটো বের করে এক টিপ নশ্টি নেয়। কিন্তু নশ্টিটা এমনই কড়া যে ভূতের কাছেও সেটা অসহ্য হয়ে ওঠে। কনষ্টেবল্‌টা সবেমাত্র তার ডান নাকটা বন্ধ করেছে, অমনি ভূতটা এতো জোরে হেঁচে ওঠে যে তিনজন

কনষ্টেবলের চোখেই নশ্টি ঢুকে যায়। হাত তুলে চোখ রগড়াতেই কৃতটা এমনভাবে অদৃশ্য হ'য়ে যায় যে তাদের সন্দেহ হয়, তারা সত্যিই ওকে ধরেছিলো কি না। সেই রাত থেকে সমস্ত পুলিশ কৃতের ভয়ে এমন শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে যে তাবা জীবন্ত কোন লোককে পরতেও ভয় পেয়ে যায় এবং কোন অপরাধীকে দেখলে দূর থেকেই বলতো, “শাস্ত্যভাবে চল যাও!” তাবশব সেই কৃতটা কালিঙ্গিন ব্রিজ থেকেও দূবে যেতে আরম্ভ ক'রে ভীতু লোকদের প্রাণে আঁসের সঞ্চার কবে।

কিন্তু যিনি আমাদের এই সম্পূর্ণ সত্য গল্পটাকে একটা আশ্চর্য্যবি রূপ দেওয়াব হেতু সেই বডলোকটির কথা আমাদের ভুললে চলবে না। একটুখানি ন্যায়েব অন্তর্ভুক্তি আমাদের বশতে বাধ্য করে যে, সেই হতভাগ্য নিম্পিষ্ট লোকটি চলে যাবার পর সেই মহান ব্যক্তিটি একটুখানি দুঃখ বোধ করেন। দুঃখটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। অন্তবে করুণাব তাবকে গ্রহণ কবার ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু তাঁব পদমর্যাদা তার প্রকাশে বাধা জন্মাতো। বন্ধু চলে গেলেও হতভাগ্য আকান্ধিত্যেব কথা তাঁর মনে হ'লো—এবং তারপর থেকে প্রতিদিনই সেই দুর্ভাগ্য—যে তাঁর তিরস্কারেব ফলেই অচেতন হ'য়ে গিয়েছিলো,— তাব ছবি তাঁর চোখেব সামনে ক্রুটে উঠতো। তার চিন্তায় তিনি এতই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন যে, এক হপা বাদে তার একজন কেবাপীকে ওর পরিচয় সংগ্রহ ক'বতে এবং তাকে সাহায্য কববার জন্য কিছু করা যায় কিনা সেটা জানতে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি হতভয় হ'য়ে যান, এবং সাবাদিন ধরে গভীর অন্তঃশোচনা করেন। একটু অনামনক হবার জন্য এবং ওই অশ্রীতিকর চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি সেই দিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাড়ীতে যান।

বন্ধুর বাঙীতে বেশ প্রীতিকর আড্ডা জমিয়ে ছেনারেল দেখতে পেলেন। তার নিজে স্তরের লোকটী হুঁ—তাঁই, আনন্দ কল্পবার আর কোন বাধা ছিলো না। অবস্থাটা তার মনের ওপর একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রলে। কথাবার্তায় তিনি সম্পূর্ণ অমায়িক এবং প্রীতিকর হ'য়ে উঠলেন, এবং বলতে কি বেশ একটা আনন্দদায়ক সন্ধ্যা তিনি কাটালেন।... তিনি পারিবারিক স্নেহ ভালোবাসায় সুখী হলেও সহরের আর একপ্রান্তে একজন বান্ধবী থাকা অনায বলে মনে করেন নি। সেই বান্ধবী তার স্ত্রীর চেয়ে ছোটও নন, অথবা স্ত্রীও ন'ন। কিন্তু এই সমস্ত কিছু কিছু অসামঞ্জস্য পৃথিবীতে থাকবেই, যার কারণ কেউ খতিয়ে দেখাতে পারে না। এইরূপে আমাদের বিখ্যাত ব্যক্তিটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গ্রেজে উঠে বসে কোচম্যানকে ক্যারেলিন আইভ্যানোভনার বাঙীতে যেতে বলে দিলেন। তাঁর গরম দামী ক্লোক দিয়ে তিনি গা ঢেকে নিলেন এবং রাশিয়ানদের আরামদায়ক একরকম বিশিষ্ট ভঙ্গিতে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। পূর্ণ সন্তোষে অতিবাহিত হৃদয় সন্ধ্যাটার কথা তিনি মনে করলেন—মনে পড়লো সেই হাসি ঠাট্টাব কণা—গা সেই ছোট চকুটিকে আমোদিত করেছিল...তার হু' একটা তিনি ফিস্ ফিস্ ক'রে আওড়ালেনও, এবং দেখতে পেলেন সেসব আগের মতই ভালো লাগছে। স্নিগ্ধ মধুর আনন্দে তিনি হাসিলেন।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে তাঁকে উদ্বাস্ত ক'রে তুলছিল—মনে হচ্ছিলো বাতাসের ফলা যেন তার মুখে কেটে কেটে বসছে—মুঠো মুঠো তুমার উড়িয়ে নিয়ে আসছে বাতাস কখনো ; কখনও তার ক্লোকটাকে পালের মতো উড়িয়ে দিচ্ছে অথবা সেটাকে ঝাপটা মেয়ে এনে ফেলছে ওর মাথার ওপর—ফলে তার হাত থেকে মুক্ত হ'তে তাঁকে ক'ম বেগ পেতে হচ্ছিলো না। ঠিক সেই সময়ে তাঁর মনে হলো যেন কে তাঁর কনার ধরে প্রচণ্ডভাবে টানছে, ফিরেই তিনি দেখলেন লোমগুয়াল

পুরনো ক্লোকপরা একটা অল্পবয়সী লোক—আতঙ্কের মধ্যে আকাক্ষিত ব'লে ওকে চিনতে পারলেন তিনি। তাঁর মুখ বরফের মত সাদা হ'য়ে গেলো—তাঁকেও ভূত বলে মনে হচ্ছিলো। তাঁর আতঙ্ক চরমে পৌঁছয় যখন তিনি দেখলেন যে সে মুখ খুলছে। তিনি তাঁর পৈশাচিক নিঃশ্বাস অস্বস্তি ক'রলেন এবং তাকে এই কথাগুলো বলতে শুনলেন, হাঃ হাঃ শেষে তোমাকে আমি পেয়েছি! শেষ পর্যন্ত তোমার কলার ধরেছি! তোমার ক্লোকটাই আমি চাই! আমার ক্লোকটা উদ্ধার করবার জন্য তুমি সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলে—উপরন্তু গালও দিয়াছিলে। এখন তুমি তোমার ক্লোকটা দাও।” হতভাগ্য বিশিষ্ট লোকটি আতঙ্কে প্রায় মরার জোগাড়। অফিসে তিনি একজন শক্তিশালী লোক, শক্তিশালী সাধারণ অধস্তন কর্মচারীদের তুলনায়। তাঁর পুরুষোচিত আকারের দিকে চেয়ে যে কেউ বলতো, “কি সুন্দর বলিষ্ট লোকটা!” বর্তমানে অন্যান্য অনেক বাহ্যিক সাহসী লোকদের মত এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি যে হার্ট আক্রান্ত হবে বলে তাঁর আশঙ্কা হলো। কাঁধের ওপর থেকে ক্লোকটা ফেলে দিয়ে বিকৃতস্বরে কোচম্যানকে চীৎকার করে বললেন, “বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাও—ঘট শীগগির সম্ভব”।

কোচম্যান সেই কণ্ঠস্বর শুনে—যে কণ্ঠস্বর সাধারণ সময়েই আতঙ্কজনক—তাঁর কোটের কলারের মধ্যে মাথা টেনে নিয়ে চাবুক ঘুরিয়ে বায়ুগাততে ছুটে চলে। পাঁচ ছ মিনিটের মধ্যেই তিনি নিজের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে যান। বিবর্ণ এবং বাকুল অবস্থায় টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢোকে, এবং ক্যারোলিন আইড্যানোভনার বাড়ীর বদলে নিজের বাড়ীতে ভীষণ কষ্টে রাতটাকে কাটান। পরদিন সকালে চা খাবার সময় তাঁর মেয়ে বলে, তুমি কি ক্যাকাসে হয়ে গেছো বাবা!” কিন্তু বাপ নীরব—সেই ঘটনা স্মরণে, অথবা কোথায় গিয়েছিলেন,

কিংবা কোথায় যাবার ইচ্ছা ছিলো, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না। ঘটনাটা তার মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিলো। “তুমি কি ক’রে সাহস কর? তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছো?”— ইত্যাদি কথা তার অশ্রুতন কর্মচারীরা এখন একটু কমই শোনে।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যেটা হ’লো সেটা হচ্ছে সেই রাত থেকে ভূতও অদৃশ্য হয়ে গেলো। জেনারেলের ক্লোকটা তার গায়ে ঠিক ঠিক লেগেছিলো। যাই হ’ক, কোন লোকের কাঁধ থেকে আর ক্লোক ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। তবুও কতকগুলো ব্যস্তবাগীশ লোকের ভয় দূর হ’লো না—তারা বার বার বলতো, যে ভূতটা সহরের দূরপ্রান্তে এখনও হানা দেয়। একজন পুলিশ বলে যে সে নিজেব চোখে একটা ভূতকে কোন একটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তাকে খামায়নি সে এজন্য যে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না। ভূতটাকে খামাতে না পেরে সে অন্তসরণ করে, তাতে ভূতটা ফিরে দাঁড়িয়ে ওর কি প্রয়োজন তা জানতে চায়—এবং ভয়ানক ঘৃণা ওর দিকে উদ্ভাসিত করে,—জীবিত লোকদের মধ্যে এতবড় হাত কখনো দেখা যায় না। হতভাগ্য পুলিশটা পেছনে ফিরে প্রাণপণে সরে পড়ে। এই ভূতটা কিন্তু আগের চেয়ে লম্বা—এবং মস্ত লম্বা একটা গোঁফ আছে তার। সেই ঘটনার পর ভূতটা অব্যবহৃত ব্রিজের দিকে দ্রুত হেঁটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

—

প্রান্তরে ম্যাক্সিম্ গোর্কী

মনের চরম অবস্থায় আমরা পেরেকফ্ ছেড়ে আসি—নেকড়ে মত ক্ষুধার্ত আমরা তখন এবং সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জন্মে ওঠেছে। কিছু রোজগারের আশায় বুধাই আমরা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, চুরি করার সব কৌশল খাটানো, এবং শেষ পর্যন্ত যখন বুঝলাম যে ওর কোনটাই সম্ভব নয়, তখন আগরার আরও এগিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম। কোথায় ? শুধু আরও দূরে।

ওই সিদ্ধান্তে সকলেই একমত হ'লো এবং পরস্পরকে সেটা জানানো হ'লো। যে পথ আমরা দীর্ঘদিন ধরে মাড়িয়ে আসছি, সেই পথ ধরে আরও দূর এগিয়ে যেতে আমরা সব তৈরীভাবে রাজী। নীরবতার ভেতর দিয়ে আমরা ওই ব্যবস্থায় পৌঁছাই। কারও কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই ওটা কুটে ওঠেনি—কিন্তু আমাদের ক্ষুধার্ত চোখের ক্রুদ্ধ দীপ্তির মধ্য দিয়েই সেটা স্থম্পষ্টভাবে অতিব্যক্ত হ'চ্ছিলো।

আমরা তিনজন। কিছুদিন থেকেই আমরা পরস্পরকে জানি। নীপারের তীরে খারাসনের এক গুড়ির দোকানে আমরা পরস্পরকে সান্নিধ্যে ছিটকে গিয়ে পড়ি। আমাদের একজন রেলওয়ে ব্যাটালিয়নে সৈনিক ছিলো, পরে পোলাণ্ডের ভিস্কুলা রেলপথে মজুরের কাজ করে লালচুল পেশীবল একজন লোক সে। সে জার্মান ভাষা বলতে পারতো, এবং বন্দীজীবনের সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলো তার।

আমাদের মত' লোকেরা তাদের অতীতের কাহিনী বলতে ভালো-বাসেন না—ভালো না বাসার সত্যিকার কারণ সবসময়ই শ্রায় হুঁকট) থাকে। সেজন্তে আমাদের মধ্যে যে যা বলতো আমরা তাই বিশ্বাস

করতাম। অর্থাৎ, বিশ্বাস করতাম আমরা বাহ্যিক—কিন্তু অন্তরে আমাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস ছিলো সামান্যই।

যখন আমাদের সাথী—একজন নীরস অল্প বয়েসী লোক, অবিখ্যাসের ভক্তিতে ঠোটট। তার সঙ্কুচিত—আমাদের বলে যে সে মন্ডো ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলো, সৈনিকটি এবং আমি নিঃসন্দেহে পরে নিলাম যে সে সত্যিই ছিলো। অন্তরে আমাদের সে ছাত্রই থাকুক অথবা চোর কিংবা পুলিশের স্পাই হ'ক সে একই কথা। খর্তবোর মধ্যে শুধু এইটুকু ছিলো যে যখন তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় তখন সে আমাদের সাথে একই স্তরের—যেহেতু ক্ষুধার্ত, পুলিশের বিশেষ দৃষ্টির পাল্লায়, গ্রামে চাষীদের কাছে সন্দেহজনক ব্যবহার পেয়েছে, এবং ক্ষুধার্ত আহঁত পশুর অসহায় যুগা নিয়ে প্রত্যেককে অশ্রদ্ধা করে, এবং প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে—এক কথায়, প্রকৃতির ভাগ্যবানদের মধ্যে এবং জীবনের মহাপ্রভুদের মধ্যে তার স্থান এবং তার মানসিক অবস্থা তাকে আমাদের সাথে একই পথের পথিক বানিয়েছিলো।

দুঃখ কষ্টই সম্পূর্ণ বিাতর চরিত্রের লোকদের এক সাথে মিলিয়ে রাখবার সব চেয়ে ভালো সংযোগস্থল; এবং আমরা সকলেই অনুভব করলাম যে নিজেদের হতভাগ্য মনে করবার আশবার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।

তৃতীয় জন হচ্ছে আমি নিজে। আমার স্বাভাবিক নম্রতার জন্য—যে নম্রতা আমি ছোট বেলা থেকেই দেখিয়ে আসছি—আমার গুন সম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না; আর অকপট হওয়ার ইচ্ছা না থাকায় আমার পাপ সম্বন্ধে আমি নীরব থাকবো। এইটুকু বললেই আমার চরিত্রের স্বত্র নির্দেশ যথেষ্ট হবে যে আমি বারবার নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে করে এসেছি এবং আজ পর্যন্তও মনে করে থাকি।

এইভাবে আমরা পেরেকব্ ছাড়িয়ে চলতে লাগলাম। সেইদিন আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো প্রান্তরে কোন একজন মেঘপালককে গ্রহণ করা। একজন মেঘপালকের কাছ থেকে যে-কেউ রুটি চাইতে পারে বখন-তখন। মেঘপালকরা পথ-চলতি লোকদের কিছু দিতে অস্বীকার করে না বড় একটা।

আমি সৈনিকটির পাশে পাশে চলছিলাম—ছাত্রটি আসছিলো গেছনে। তার কাঁপে একটা জিনিস ঝুলছিলো—যাকে এক সময় জ্যাকেট বলে মনে করা চলতো। তার চোখাকোণবিশিষ্ট এবং ছোট ছোট ক'রে চুল-ছাঁটা মাথায় একটা চওড়া টুপির জীর্ণ অংশ ছিলো। অসংখ্য তালি দেওয়া ধূসর পায়জামায় তার কৃণ পা দুখানা ঢাকা। রাস্তা থেকে বুড়োনে এক জোড়া বুটের তলা তার জামা থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া খানিকটা সূতো দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা এবং সে-যন্ত্রটাকে সে বলতো স্যাণ্ডাল। অনেকটা ধুলো উড়িয়ে নিঃশব্দে হেটে চলছিলো সে—ছোট ছোট সবুজ চোখ দুটো জল জল করে জলছিলো। সৈনিকটি একটা লাল রংএর তুলোর সার্ট পরে ছিলো—যা তার নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সে খারসনে নিজের হাতে রোজগার করে। সার্টের ওপর একটা গরম তুলোর ওয়েষ্টকোট; একটা অম্পষ্ট রংএর মিলিটারি টুপি ডান দ্রুপ ওপর ঝুলে পড়ছিলো এবং সেটা সৈনিকদের নিয়মাহসারে। চওড়া রুক্ষ পায়জামাটা পায়ের ওপর পত্ পত্ করে উড়ছিলো। পা দুটো তার খালি। আমিও নয় পা।

আমরা চলতে লাগলাম। আমাদের চারিদিকে জমকালো ভঙ্গিতে প্রান্তর প্রসারিত। নির্মেষ গ্রীষ্মকালীন আকাশের অভ্যাক নীল গম্বুজের তলে একটা বিরাট কালো খালার মত প্রান্তর। ধূসর হুমিয়ার রাস্তা প্রান্তর ভেদ করে প্রান্তর একটা রেখার মত চলে গেছে—প্রথম রোদে তেড়ে-উঠা পথ আমাদের পা ঝলসিয়ে দিচ্ছিলো বাঁধ বাঁধ। এখানে

সেখানে কাটা শস্যের গোত্রগুলো কেত—সৈনিকের খোঁচ খোঁচ
কাঁড়বুড় গালের সাথে ওর একটা অদ্ভুত মিল ছিলো।

আমাদের চলার সাথে সে কর্কশ খাদগুলো করে গান ধরে দেয়—
“তোমার উপাসনার দিনটিকে আমরা প্রশংসা করি—প্রভু, তাকে ক’রে
তুলি আমরা মহিমায়.....”

পণ্টনে কাজ করবার সময় সে বাটারিয়ান চার্চে গায়ক হিসাবে
কাজ করতো, ফলে স্তোত্র এবং চার্চের গান সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান
ছিলো—আমাদের কথাবার্তায় ঢিলে পড়লে সেই জ্ঞানটারই সে অপ-
প্রয়োগ করতো।

আমাদের সম্মুখভাগে দিগন্তবেশায় বৃদ্ধ একটা রেখা উঁচু হয়ে উঠে
গেছে—স্বিচ্ছ রংটা তার বেগুনী থেকে ক্যাকাসে লাল গিয়ে মিশেছে।
“ওটা নিশ্চয়ই ক্রিমিয়ার পাহাড়”—ভাঙ্গাগলায় ছাত্রটি বলে।

“পাহাড়!” সৈনিক চীৎকার করে ওঠে। “এতো শীগগির ওটাকে
দেখা যাবে না বন্ধু। ওটা মেঘ... .. শুধু একটা মেঘ। আর কি
রকম মেঘটা! জ্যানবেবির মোরক্সা এবং ছুধের মত”।

আমি ভাবলাম যে মেঘটা সত্যি সত্যি মোরক্সা হলে মন্দ হ’তো না—
সে কথা মনে হতেই ক্ষিদে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—আমাদের বর্তমানের
সেই যন্ত্রণা।

“নরকে যাক সব”—থুতু ফেলতে ফেলতে সৈনিক বন্ধুটি অভিশাপ
দেয়। “একটা জীবন্ত প্রাণীরও দেখা পাওয়া গেলো না। কেউই..... শীতে
ভালুকদের মত খাবা চাটা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই দেখছি”।

—“বলেছিলাম তোমাকে যে আমাদের গাঁয়ে যাওয়া উচিত”—
সময়টাকে একটু হাল্কা কয়বার জন্যে ছাত্রটি বলে।

—“তুমি আমাদের বলেছিলে”—সৈনিকটি প্রত্যুত্তর দেয় : “কেহেতু

জুমি শিক্ষিত সেইদেড় তোমারই বলা উচিত। কিন্তু লোকালয় কোথায়—
শহরতান জানে!

ছাত্রটি কিছুই বলে না, শুধু ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। স্বর্ষ ফুঁরে
বায়। দিগন্তের মেঘ বিচিত্র বর্ণনাভীত রঙে রঞ্জিত হয়ে নাচতে থাকে।
মাটি ও নূনের গন্ধ পাওয়া যায়। এই শুকনো মিষ্টি গন্ধ আমাদের ক্রিদে
জীবিতর করে তোলে। আমাদের তলপেট মৃচড়ে বিষিয়ে ওঠে—একটা
অদ্ভুত বিদ্রী অন্ত্রুতি! শরীরের পেশীগুলো থেকে ধীরে ধীরে ঘাম
ঝরে পড়ছে বলে বোধ হয়। সেটা শুকিয়ে যায় এবং পেশীর, কোমলতা
দূর হতে থাকে। মুখের ভেতরটা গলা শুক শুকিয়ে গেছে এবং
হুলহুটানোর মত একটা ঘ্রাণা হ'চ্ছে। মাথাটা কেমন গোলমলে
হয়ে গেছে। ছোট ছোট কালো কালো কি সব চোখের সামনে
নাচতে থাকে। কখনও কখনও সেগুলো ধুমায়িত মাংসের টুকরো বলে
মনে হয়—আবার কখনো ওরা কুটির টুকরোর রূপ ধরে আসে। স্বতিতে
এমনি সব অশরীরী। ছায়া বা বোবা প্রেত যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠে
.....তারপর মনে হয় যেন একথানা ছুরি তলপেটে সত্যি সত্যি
সেঁধিয়ে গেল!

তবুও আমরা চলতে থাকি। চলতে চলতে আমাদের অস্ত্রভূতি
নিয়ে আলোচনা করি, এবং মেয়ের কোন আকস্মিক চিহ্নের জন্তু আশে
পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকি, অথবা আর্মেনিয়ার বাজারে-
নিয়ে-মাওয়া তাতারের কলের গাড়ীক তীক্ষ্ণ ক্যাচর ক্যাচর শব্দের জন্তু
কান পেতে থাকি।

কিন্তু প্রান্তর নির্জন এবং নিস্তব্ধ। এই কঠোর দিনটার আগের দিন
ইতিমধ্যে আমরা চার পাউণ্ড রাইএর কুটি আর পাঁচটা তরমুজ খেয়ে
প্রায় চল্লিশ মাইল হেঁটেছিলাম—আয়ের সাথে ব্যঙ্গ সমান হয় নি, তাই

পরেরেপের বাজারে ঘুমানোর পর ক্ষিপের জালায় আমাদের ঘুম তেড়ে যায়।

জামা জাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ছাত্রটি আমাদের না ঘুমিয়ে রাখে কাজ করতেই বলেছিলো:।- ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংসের পরিকল্পনা সভ্যসমাজে উল্লেখ করা হয় না বলে আর সে সম্বন্ধে কিছু বলবো না। আমার উদ্দেশ্য ছিলো জায়গারায়ণ থাকা, নীচ হওয়াটা আমারই স্বার্থের বাইরে—আমি জানি, আমাদের উচ্চ সভ্যতার দিকে উঠে মানুষ ক্রমেই কোমলচিত্ত হচ্ছে, এবং যখন প্রতিবেশীকে দমবদ্ধ করবার জন্ত কেউ তার গলা টিপে ধরে, তখন সমন্বয়পযোগী যতদূর সম্ভব দয়া এবং শিষ্টতার সাথেই সেটা করা হয়। আমার নিজের গলার অভিজ্ঞতা আমাকে নৈতিকতার ওই প্রগতিই লক্ষ্য করিয়েছে। ফলে সন্তোষজনক বিখ্যাসের সাথে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, এই দুনিয়ার সব কিছুই বিকাশ এবং উন্নতি হয়ে চলেছে। কারাগার, গুঁড়িখানা এবং বেণ্যালয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধিতে এই প্রগতি বিশেষভাবেই ধরা পড়ে।

সুতরাং আমাদের কুখ্যাত লালাকে গিলে এবং তলপেটের বেদনাকে শাস্ত করবার জন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে আমরা পরিত্যক্ত নিরীলা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একটা অস্পষ্ট আশা নিয়ে স্বর্গান্তের রক্তাতার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের সামনে বিচিত্র অন্তরাগে রঙীন স্নিগ্ধ মেঘের মধ্যে স্বর্গ ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলো. আর পেছনে আমাদের হুধারে নীল-অন্ধকার প্রান্তর থেকে আকাশে উঠে গিয়ে চারপাশের নিষ্করণ দিগন্তরেখাকে সঙ্গীর্ণ করে দিচ্ছিলো।

একটুকুরো কাঠ তুলে নিয়ে সৈনিকটি বলে, “তাই, কিছু কাঠ-কুটা বোঁগাড় কর। প্রান্তরটাতে আমাদের রাত কাটাতে হবে, এবং শিশিরও পড়ছে। শুকনো গোবর, ডাল-পালা যা কিছু হ'ক ওতেই চলবে।”

রাস্তার দু'দ্বারে 'আমরা' পৃথক হয়ে গিয়ে শুকনো ঘাস এবং এক-কোণে দাছ'জিনিষ বুড়াত্তে লাগানাম। যতবারই মাটিতে ঝোঁকার প্রয়োজন হচ্ছিলো ততবারই সমস্ত শরীরটার ভাব হচ্ছিলো মাটির উপর লুটিয়ে পড়ার, এবং শাস্তভাবে শুয়ে ওঠে কালো এবং উর্বন মাটি মুঠো মুঠে খাবার—যতক্ষণ পর্বস্ত পারা যায় শুধু খেয়ে যাওয়া এবং তারপর শোওয়া। যদি চিরকালের জন্তুই ঘূমাতে হয় তাতেই বা ক্ষতি কি—একজন যদি সত্যি খেতে পারে এবং গরম ঘন খাবারগুলো শুকনো গলা দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুধাত উদগ্রীব ব্যথাক্রিষ্ট পাকস্থলীতে নেমে যাবাব অচক্ষুতি পেতে পারে!

“যদি আমরা শুধু একটা গাছের মূল বা সে-রকম কিছুও পেতাম,” সৈনিকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলে। “অনেক গুল আছে যা খাওয়া যায় . . .”

কিন্তু কালো চষা মাটিতে কোন মূল নেই। দক্ষিণের রাত তাড়াতাড়ি নেমে আসে। সূর্যের শেষ রশ্মি নিভে যেতেই গাঢ় নীল আকাশে তারাগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে। আমাদের আঁশে পাশের ছায়া নিবিড়তর হ'য়ে উঠে প্রান্তরের সীমাহীন বিস্তৃতিকে মুছে দেয়।

“তাই”, ছাত্রটি ফিস ফিস করে বলে, “আমাদের বাঁ পাশে একজন লোক শুয়ে আছে দেখো।”

—“লোক”? সৈনিক সন্দিক্তভাবে প্রশ্ন করে। ওখানে সে শুয়ে থাকবে কেন?”

“গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। মাঠে যদি সে শুয়ে থাকতে পারে, তাহলে সম্ভবত ওর কাছে কিছু কটা আছে”, ছাত্রটি সাহস করে বলে। সৈনিকটি সেদিকে তাকিয়ে সঙ্কল্পের সাথে খুতু ফেলে বলে, “চল আমরা ওর কাছে যাই।”

“ছাত্রটির তীক্ষ্ণ সবুজ চোখ দুটোই শুধু প্রায় পকাশ হাত দুই কালো শুপুটার পাশে একটা লোককে দেখতে পারলো। চষা ক্ষেতের টলটার

ওপর দিয়ে জল পা চালিয়ে আমরা গুর দিকে এগিয়ে চললাম। খাবারের ক্ষুধা আমাদের নতুন-জাশা আশা আমাদের সিনেদের কষ্টকে বাড়িয়ে দেয়। আমরা তার একেবারে কাছে গিয়ে পড়লাম—কিন্তু লোকটা সাড়া দিলো না।

—“বোধ হয় ওটা মৃত্যু নয়।” সৈনিক বিষন্নভাবে সকলের মনোভাব ব্যক্ত করে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমাদের সংশয় ঘুচে যায়। মাটির ওপরকার তৃপটা হঠাৎ নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। আমরা দেখলাম সেটা সত্যিকার জীবন্ত একটা মানুষ—হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে হাতটা প্রসারিত করে দিয়েছে।

“খেমে যাও, নইলে গুলি করবো!” কর্কশ-কম্পিত স্বরে সে বলে ওঠে। অফুট একটা শব্দ নোংরা বাতাসে আলোড়ন তোলে।

আদেশ করা। মাত্র আমরা খেমে যাই—স্বমধুর সম্ভাষণের স্বাভাবিক হয়ে আমরা কয়েক সেকেন্ড চূপচাপ থাকি।

—“আচ্ছা, আমি কখনও...পাশে!” সৈনিক তিরস্কারের স্বরে বিভ্রিড় করে বলতে থাকে।

“এ্যা! রিভলভার নিয়ে বেড়ানো”, চিন্তিত ভাবে ছাত্রটি বলে। “নিশ্চয়ই বড় দরের মাছ হবে”।

“এই”! সৈনিক টাঁককার করে ওঠে। সে নিশ্চয়ই কোন কিছু মডেল ঠিক ক’টরেছে।

লোকটা তার ভঙ্গী বদলায় না, কথাও বলে না।

—“এই শুনছ!...আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না... আমাদের কিছু রুটি দাও....আমর না খেয়ে আছি। খ্রীষ্টের নামে কিছু রুটি দাও তাই”!

শেষের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে বলা হয়।

লোকটা নীরব।

“তুমি কি স্নান করতে পারো না?” রাগ এবং নৈরাশ্যে কীপতে কীপতে সৈনিক জিজ্ঞাসা করে। “আমাদের কিছু কুড়ি দাও। আমরা তোমার কাছে যাব না। আমাদের কাছে ছুঁড়ে দাও।”

—“আচ্ছা বেশ”, লোকটা হঠাৎ বলে ওঠে।

সে যদি বলতো, ‘আমার প্রিয় ভাইগণ,’ এবং ওই কথাগুলোর মধ্যে খুব পবিত্র ভাব ঢেলে দিতো, তা হলেও সেগুলো আমাদের মনে ভেদন সাদা জাগাতে পারতো না, অথবা আমাদের মানবোচিত গুণের অধিকারী করতে পারতো না, সেই কর্কশ এবং আচম্বিত “আচ্ছা বেশ” কথার স্বরা যেমনটি করেছিলো।

“আমাদের দেখে তবু পাবেন না,” সদস্যভাবে সৈনিক বলে। ঠোঁটে তার অকৃতজ্ঞতার হাসি—আমাদের থেকে কুড়ি পা দুবে থাকার ক্ষেত্রে যদিও লোকটা সেই হাসি দেখতে পেলো না।

“আমরা শান্তিপ্ৰিয় লোক। আমরা রাশিয়া থেকে কুবানের পথে চলেছি। সব টাকা-পয়সা আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং সঙ্গে যা কিছু ছিলো সবই খেয়ে ফেলেছি। দুদিন আগে শুধু আমরা একবার খেয়েছি”।

আকাশে হাত ঘুরিয়ে সে বলে, “দাঁড়াও”। কালো একটা দলা উঁচু হয়ে এসে আমাদের কাছে চমক-জ্বমির ওপর পড়ে। “ছাত্রটি ১০০ ওপর লাফিয়ে গিয়ে পড়ে।

“দাঁড়াও, আরও আছে।...এই শেষ। আমার আর নেই”।

ছাত্রটি যখন প্রথমবারকার দেওয়া জিনিসগুলো কুড়িয়ে একজায়গায় তখন দেখা যায় যে মাটি-মাথা প্রায় চার পাউণ্ড বাসি কালো কুড়ি। ওই অবস্থাটা আমাদের একটুও অস্ববিধায় কেললে না, বরং ঠট্টা আমাদের খুবই আনন্দিত করলে, কারণ, বাসি কুড়ি নতুন কুড়ির চেয়ে বেশি প্রীতিকর, যেহেতু নতুন কুড়িতে রস কম।

“তোমাব.....এই তোমার..... আর এই তোমার,” সৈনিক আশ্বাসের প্রত্যেককে ভাগ করে দেয়। “ওগুলো সমান হয় নি। তোমার থেকে এক টুকরো নিজে হবে পণ্ডিত লোক, নইলে ওর ঠিক ভাগ ঠিক হবে না।”

ছাত্রটি অস্বস্তিতে ভাবে কটির একটুকুখানি ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। আমি এক গ্রাস তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে থাকি। আস্তে আস্তে চিবোই। আবার চোয়ালের চাঞ্চল্যকে দমন করে উঠতে পারি না,—চোয়াল তখন পাথর চিবোতে পর্যন্ত রাজী। গলায় খিঁচুনি অস্বস্তিকর করে আমার তীব্র আনন্দ হয়, এবং ধীরে ধীরে একটু একটু করে ওকে সন্তুষ্ট করি। গরম অব্যক্ত অবর্ণনীয় মিষ্টি রুটি গ্রাসের পর গ্রাস গিয়ে জলন্ত পাকস্থলীতে ঢোকে, এবং মনে হয় তৎক্ষণাৎ যেন ওটা রক্ত এবং ঘিলুতে পরিণত হয়ে যায়। যে পরিমাণে পাকস্থলী ভরতে থাকে সেই পরিমাণে আনন্দ—অপূর্ব শান্ত এবং সতেজ আনন্দ অন্তরের মধ্যে জল জল করে। অভিশপ্ত দিন কটির সদাজাগ্রত ক্ষুধার কথা আমি ভুলে যাই, আমার কর্মের উদ্দেশ্যের কথাও আমি ভুলে যাই—যারা আমারই মত স্থখানুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু যখন হাত দিয়ে শেষ কটির টুকরো মুখে ঝেলে দিলাম, তখন মারাত্মক রকম ক্ষিদে অনুভব করলাম।

“শয়তানটার কাছে বোধ হয় আরও কটি আছে, এবং আমার মনে হয় কিছু মাংসও তার আছে,”—মাটির ওপর বসে পেট ডলতে ডলতে সৈনিক বিড় বিড় করে বলে।

—“নিশ্চয়ই তাব আছে। কটিতে মাংসের গন্ধ ছিলো। আমি নিশ্চিত যে তার আরও কটি আছে”—ছাত্রটি ফিস্ ফিস্ করে বলে।
“ওই রিডলভার্ট না থাকলে” ...

—“লোকটা কে হে?”

“আমাদের তাই আইজাক্ নিশ্চয়ই।”

কুকুরট। সৈনিক মস্তবা করে।

আমরা পাশাপাশি ব’সে আমাদের উপকারক যেখানে রিতগভারটা নিয়ে বসে আছে সেইদিকেই সপ্রাণ দৃষ্টিতে চাইলাম। কোন শব্দই তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আমাদের চারপাশে রাত্রি তার কালো সৈন্যদের জমিয়ে তোলে। একটা প্রগাঢ় নিশ্চলতা প্রান্তরে বিরাজ করে। পরস্পরের নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে পাহাড়ে ই’দ্রের করুণ চীৎকার ভেসে আসে। আকাশের সজীব ফুল তারকাগুলো মাথার উপর আলো দিতে থাকে। আমরা ক্ষুধাত।

গর্বের সাথেই ব’লবো যে নেই অদ্ভুত রাতে আমার ক্লমিক কম্‌রেড-দের আমি কোন অংশে খারাপ অথবা ভাল বোধ করিনি। আমি বল-লাম, যে চল আমরা ও লোকটার কাছে যাই। ওর কোন ক্ষতি ক’রবো না আমরা, কিন্তু তার সব খাবারটা খেয়ে নেবো। যদি গুলি করে সে, —করুক। তিনজনের ভেতর একজন হয়তো আহত হবে, তাও সম্ভবত নয়,—একজন আহত হ’লে তার আঘাতটা গুরুতর নাও হ’তে পারে।

“এসো”, লাক্সিয়ে উঠে সৈনিকটি ব’লে—এবং আমরা প্রায় ছুটেই চললাম—ছাত্রটি আমাদের পেছন পেছন আসে।

—“কম্‌রেড্‌!” সৈনিক ভৎসনার স্বরে বলে।

ভাল! ভাল! অস্পষ্ট একটা কথা আমাদের কানে আসে, কোন কিছু ধরার অল্পট শব্দ, একটুখানি আগুনের শিখা, তারপর, তীব্র একটা শব্দ প্রতিধ্বনিত হ’য়ে উঠে।

“লক্ষ্যভ্রষ্ট হ’য়েছে!” সৈনিক আনন্দে চীৎকার ক’রে উঠে; এবং এক লাফে গিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছয়। “এখন, শয়তান, এখন ডুমিই এটা পাবে।”

ছাত্রটি লোকটার থলির উপর গিয়ে লাফিয়ে পড়ে ; সেই “শয়তান” শিঠ্ গড়াগড়ি দিতে দিতে নিজকে হাত দিয়ে ঢেকে আত্ননাদ শুরু করেছে।

“কি হে শয়তান !” উদ্ভ্রান্তভাবে সৈনিক চীৎকার করে বলে। সে ততক্ষণ লোকটাকে লাথি মারবার জন্তে পা তুলেছে। সে নিশ্চয়ই নিজের শরীরে গুলি করে ফেলেছে। “এই ! তুমি কি নিজেকেই গুলি করেছো ?”

“এই যে প্রচুর মাংস, শিঠে আরও কটি রয়েছে রে তাই”, উদ্ভ্রান্তভাবে ছাত্রটি বলে।

“নিপাত যাও তুমি... এসো বন্ধুরা খাওয়া যাক !” সৈনিক চীৎকার করে বলে।

লোকটার হাত থেকে আমি রিভলভারটা নিয়ে নিই। তার আত্ননাদ ধেমো গিয়েছিলো। একেবারে স্থিরভাবে সে শুয়ে ছিলো। রিভলভারের খাঁজে আরও একটা বুলেট ছিলো।

আবার নিশ্চলভাবে আমরা খেয়ে চলি। লোকটাও চুপচাপ পড়ে থাকে—তার শরীরের কোন অংশই একটুও নড়াচড়া করে না। তারদিকে একটুও মন দিই না আমরা।

—“তাই, তোমরা কি সত্যি ক্রটির জন্তেই এসব করেছো ?”—একটা কম্পিত কর্কশ কণ্ঠ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

সবাই আমরা চমকে উঠি। এমনকি ছাত্রটির দম বন্ধ হয়ে আসে, মাটির উপর ঝুঁকে সে কাসতে থাকে।

একমুঠো খাবার চিবোতে চিবোতে সৈনিক ওকে অভিশাপ দিতে থাকে—

“এই কুকুর, পচা কাঠের মতই কি তুমি ভেজে পড় ! তুমি কি মনে করেছিলে যে আমরা তোমার চামড়া তুলে ফেলতে চাই ? তোমার চামড়া আমাদের কোন্ কাজে লাগবে ? মূর্খ, অপদার্থ কোথাকার !

নিজের কাছে অস্ত্র রেখে লোককে গুলি করা ! শয়তান !”

সারা সময়টা সে খাচ্ছিলো ব'লে এই তৎসনার তীব্রতা। অনেকটা কমে যায়।

“দাঁড়াও, আগে আমরা খেয়ে নিই, তারপর তোমার সবকিছু ব্যবস্থা করছি।”—ছাত্রটি ভয় দেখিয়ে বলে।

এর ফলে একটা করুণ চীৎকার এবং কান্না রাতের নীরবতা ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের ভীত ক'রে তোলে।

“ভাই সব... কি ক'রে আমি জানবো? ভয় পেয়েছিলাম ব'লেই আমি গুলি করি। নিউ এথেন্স থেকে আমি স্মলেন্সকে যাচ্ছি।.... হায় ভগবান! জ্বরটা আমাকে ধরেছে... সূর্য অস্ত যাবার সময় ওটা আসে... আমি দারুণ হতভাগ্য ব'লেই.. জ্বরের জ্বলে আমি এথেন্স ছেড়ে আসি.... সেখানে আমি মিস্ত্রীর কাজ করতাম... মিস্ত্রীগিরি আমার ব্যবসা..... বাড়ীতে আমার স্ত্রী আর দুটো মেয়ে আছে। চার বছর আমি তাদের দেখি নি”... ভাই..... সবটাই তোমরা খেয়ে ফেল।”

তুমি না ব'লেও আমরা সেটা ক'রবো”—ছাত্রটি বলে।

“হা ভগবান, যদি শুধু জানতাম যে আপনারা দয়ালু, শান্তিপ্ৰিয় লোক.... আপনার মনে ক'রবেন না যে আমি গুলি ছুঁড়তাম। কিন্তু এই প্রান্তরে রাস্তির বেলা আপনারা কি করতেন ভাই?... আমি কি দোষী?”

কথা ব'লতে ব'লতে সে কাঁদছিলো, অথবা আরও শুদ্ধ করে বলা যায়, কল্পিতভীত এবং করুণ একটা শব্দ বের করছিলো।

“এখন আবার ক্যান্ড্যানানি লাগিয়ে দিয়েছে,”—স্বপ্নার সাথে সৈনিক বলে।

“সম্ভবত কিছু টাকাকড়ি আছে ওর কাছে” ছাত্রটি ইঙ্গিত করে।

সৈনিক চোখটা অর্ধেক বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে হেলে ওঠে।

“অভয়ান করা সবচেয়ে তুমি ওস্তাদ .. এসো একটা আগুন জালিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়া থাক” ।

‘আর ওর সবচেয়ে ?’ ছাত্রটি শুধায় ।

‘জাহাঙ্গিরে থাক ও । তুমি ওকে সেক্ষ ক’রতে চাও না নিশ্চয়ই ?’

“ওই ওর প্রাপ্য,” ছাত্রটি তার চোখা মাথাটা নাড়ে ।

যে জিনিসগুলো আমরা জড়ো করেছিলাম সেগুলো আনতে চললাম । মিস্ট্রীটার ভীষণ চীৎকারে খেমে গিয়ে আমরা ওসব ফেলে দিয়েছিলাম । ওগুলো নিয়ে এসে শীগ্গিরই আগুন জালিয়ে তার পাশে বসলাম । শান্ত রাত্রিতে ওটা ধীরে ধীরে জ্বলে যে ছোট জায়গাটার আমরা বসেছিলাম সে জায়গাটা আলোকিত করে তুলেছিলো । তজ্জাচ্ছন্ন বোধ ক’রছিলাম আমরা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আবাব খেতে লাগলাম ।

“ভাই সব”; মিস্ট্রীটা বলে উঠে । আমাদের থেকে তিন পা দূরে সে শুয়েছিলো, এবং মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো আমার কাছে, যেন ও ফিস্ ফিস্ ক’রে কি বলছে ।

“কি” ! সৈনিক জিজ্ঞাসা করে ।

“আপনাদের কাছে কি আসতে পারি আমি .. ওই আগুনের কাছে ? আমি মরতে বসেছি ।...হাড়গুলো সব টন্ টন্ ক’রছে ।.....হায় ভগবান, আমি আর বাড়ী পৌছাতে পারতাম না” ।

“এখানে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে থাক”—‘ছাত্রটি বলে ।

আন্তে আন্তে, যেন একখানা হাত অথবা পা হারাবার ভয়ে, মিস্ট্রীটা মাটির উপর দিয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে আসে । লোকটা ঢ্যাঙ্গা—ভয়ঙ্কর কৃশ । তার পোষাক ভয়ঙ্কর রকম ঢিলে হয়ে তার শরীরে ঝুলতে থাকে । বড়ো বড়ো ব্যাখাতরা চোখ দুটোয় তার যন্ত্রণার ছাপ । তার বিকৃত মুখটা শীর্ণ আগুনের আভাতেও হঠাৎ মূক্য এবং প্রাণহীন বলে মনে হয় । সারা শরীরটা তার কাপছিলো । একটা স্বাভাবিক দুঃখ

ওর স্তম্ভ আমাদের মনে জাগে। তার দ্বা, দুর্বল হাতটা আঙনের ওপর সোজা করে ধরে সে হাড়-বের-করা আঙ্গুলগুলো ডলতে থাকে। গিটিগুলো ধীরে ধীরে এবং ক্লীণভাবে বেঁকে যায়। সব কিছু বলা এবং করা হয়ে গেলে ওর দিকে চাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার বলে মনে হয়।

“তুমি এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে চলো কেন? এর মানে কি, অ্যা!” সৈনিক গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করে।

“ওরা আমাকে আনতে নিষেধ করেছিলো.....তারা বলেছিলো..... জনপথে.....ক্রিমিয়া দিয়ে আসতে..... বাতাসের স্বর্যে বলেছিলো তারা। আর এখন ভাই সব..... আমি আর যেতে পারি না..... মরতে বসেছি আমি। এই প্রাস্তরের মধ্যে একা আমাকে মরতে হবে... পাখীগুলো আমাকে ঠোকরাবে এবং কেউই আমাকে চিনতে পারবে না আমার স্ত্রী.....আমার ছোট ছোট মেয়েগুলো আমার প্রত্যাশার আছে.....তাদের কাছে আমি লিখেছিলাম.....আর আমার হাড়গুলো, প্রাস্তরের জলে ধুয়ে যাবে.....ভগবান, ভগবান।”

আহত নেকড়ের মত সে হাউ হাউ করে উঠে।

“আঃ নরক!” রেগে লাফ দিয়ে সৈনিকটি চীৎকার করে উঠে। “তোমার প্যানপ্যানানি থামাও! আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও। মরছো তুমি? বেশ মরতে থাকো—ও নিয়ে অত চীৎকার করো না। তুমি হারিয়ে যাবে না।”

“ওর মাথাটা হুঁকে দাও”—ছাত্রটি ইঙ্গিত করে।

“চল বুমানো যাক।” আমি বললাম। “আর তোমার সম্বন্ধে—যদি আঙনের ধারে থাকতে চাও তবে ঘ্যানর ঘ্যানর করো না।”

“শুনতে পাচ্ছো?” সৈনিক ক্রুদ্ধভাবে বলে। “ও বা বললো তা মনে রেখো। তুমি ভাবছো, তোমাকে দয়া করে সেবা করবো, যেহেতু তুমি এক টুকরো কটি আমাদের হুঁড়ে দিয়েছিলে এবং ক্লিঃ করেছিলে?”

আহা! যামে যাও তুমি! অন্তে হয়তো.....ফোঃ!”

সৈনিক চুপ করে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ে। ছাত্রটি আগেই শুয়ে পড়েছে। আমিও শুয়ে পড়লাম। সেই ভয়ঙ্কর মিস্ত্রীটা দল পাঁকিয়ে আগুনের দিকে সরে যায় এবং ওর দিকে নিশ্চলভাবে চেয়ে থাকে। আমি ওর ডান পাশে শুয়েছিলাম, তাই ওর দাঁতের ঠক ঠক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাত্রটি কুণ্ডলী পাঁকিয়ে বাঁ ধারে শুয়েছিলো এবং আপাততঃ-দৃষ্টিতে তাকে ঘুমিয়েছে বলে মনে হলো। মুখ উচু করে সৈনিকটি শুয়েছিলো— হাত দুটো তার মাথার নীচে—দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ।

কি অদ্ভুত রাত্রি! কত অসংখ্য নক্ষত্র! গরম বলে মনে হয় গুণ্ডলো! একটু পরে আমার দিকে সে ফেরে। কি অদ্ভুত আকাশটা! আকাশের চেয়ে কবলের মতই মনে হয়। এ রকম ভবঘুরে জীবনই আমি ভালোবাসি বন্ধু!..... কঠোর অথবা অনাহারী জীবন হ’তে পারে, কিন্তু এটা মুক্ত অবাধ!... ..তোমার ওপর চোখ রাঙাবার কেউ নেই.....তুমি নিজেই তোমার প্রভু..... যদি নিজের মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাও, কেউ নিষেধ করবে না.....কেমন চমৎকার! ক্রিকেটাই আজকাল আমাদের খারাপ পথে এনেছে। কিন্তু এখানে আমি এখন আকাশের দিকে চেয়ে আছি... তারাগুলো আমাদের ইশারা করছে। তা’রা বোধ হয় বলছে, “কিছু মনে করো না ল্যাকাটিন, পৃথিবীর ওপর ঘুরে বেড়াও, কিন্তু কারও কাছে নতি স্বীকার ক’রো নাঅঃ! .. অন্তরে কেমন আরাম বোধ করা যাচ্ছে। আর, তুমি কেমন আছো মিস্ত্রী? আমার ওপর রাগ করো না, এবং কোন কিছুকে ভয় করবার প্রয়োজন নেই!... তোমার রুটি খেয়েছি, তাতে কি হয়েছে? তোমার রুটি ছিলো, আমাদের ছিলো না, সেজগেই তোমারটা খেয়েছি... ..আর তুমি অসত্যের মত আমাদের উপর বলেই ছোড়! আমাদের তব্বক চড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি, তুমি পড়ে না গেলে, তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি তোমাকেই দিতাম ..

ও, আর কটির সন্ধে, কালই তুমি পেরেকপ্‌এ গিরে কিনতে পারবে.....
তোমার টাকাকড়ি আছে আমি জানি...কত দিন থেকে তোমার অর ?...

অনেক্ষ ধরে আমি সৈনিকের গভীর নাকডাকা এবং মিত্রীর কশ্মিত
স্বর শুনতে পাই। অন্ধকার কালো রাত পৃথিবীর ওপর ক্রমে ক্রমে
নেমে আসে; বৃকটা হুগন্ধ সজল বাতাসে ভরে উঠেছে আমার। আগুনটা
স্তির আলো বিকীরণ করছিলো এবং বেশ উত্তাপ দিচ্ছিলো। চোখ বুঁজে
এলো। তন্ত্রার মধ্য দিয়ে একটি আরামদায়ক পবিত্রতাব বয়ে গেল যেন।

*

*

*

“উঠে পড়! তাড়াতাড়ি! চল রওনা হয়ে পড়া যাক!”

“একটা আতঙ্কের ভাব নিয়ে সৈনিকের সাহায্যে লাফিয়ে উঠলাম—
সে আমার প্রান্তর ধরে মাটি থেকে ওপরের দিকে টানছিলো।

“চলো, জোরে এগিয়ে চলো!”

“তার মুখটা গভীর এবং উদ্বেগে ভরা। আমি চারপাশে চাইলাম।
সূর্য উঠেছিলো। গুর গোলাপী আলো গিয়ে পড়েছিলো মিত্রীটার শান্ত
নীল মুখানার ওপর। তার মুখটা হাঁ করা। চোখ দুটো কোটর থেকে
ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো—উজ্জল আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো চোখ
দুটো। জামাটা বুকের কাছে ছেঁড়া, তার ভঙ্গী অস্বাভাবিক এবং
আকস্মিক।

“ভাল করে দেখলে? চলে এসো, আমি বলছি।” সৈনিক আমার
হাত ধরে টানতে লাগলো।

“ও কি মারা গেছে?” প্রভাতী হাওয়ার তীব্রতায় আমি কাঁপতে
কাঁপতে বললাম।

“হ্যাঁ, তাই বলতে হয় বৈ কি? তোমার গলা টিপে ধরলে তুমি
মরবেই, মরবে না?” সৈনিক পরিত্রাণ করে বললে।

“জানি কি...?” আমি চীৎকার করে বললাম।

“আর কে? তুমি? না আমি? তোমাদের একজন বিদ্বান লোক খুব হৃদয়ভাৱেই কাজ শেষ ক’রেছে এবং কম্বোজদের অসহায়ত্বে ফেলে রেখে গেছে। শুধু যদি কাল জানতাম, তবে আমি “ওটাকেই” নিজ হাতে শেষ ক’রতাম। এক ঘায় ব্যাটাকে মেরে ফেলতাম। শুধু মাথায় একটা ফলে, দুনিয়ায় একটা শয়তান কমত। বুঝছো সে কি ক’রেছে? আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে, যাতে কোন লোক আমাদের এই প্রাস্তরে দেখতে না পায়। বুঝছো? তারা আজকেই মিস্ট্রীটাকে দেখতে পাবে; বুঝবে ওটাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে—ওর জিনিসপত্র বাহাজানি করে নেয়া হয়েছে। আমাদের মত লোকদের খুঁজতে আরম্ভ ক’রে দেবে। আমরা কোথেকে আসছি, কোথায় আমরা ঘুমিয়েছি ওরা জিজ্ঞাসা ক’রবে..তারপর আমাদের গ্রেপ্তার ক’রবে। যদিও আমাদের কাছে কিছুই নেই। কিন্তু.. এই যে আমার বুকের মধ্যে তার রিভলভারটা আছে!”

—“ওটা ফেলে দাও,” আমি তাকে সাবধান ক’রে দিলাম।

“কেন?” চিন্তিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করে। “এটা মূল্যবান জিনিস। তারা শেষ পর্যন্ত আমাদের না-ধরতেও তো পারে...না, এটা ফেলে দেবো না। এটার দাম তিন রুবল। আর এটাতে আরও একটা বুলেট আছে। বুঝি না, কত টাকা সে ওই নোংরা শয়তানটার কাছ থেকে লুট ক’রেছে!”

‘মিস্ট্রীটার ছোট মেয়েগুলোর জন্যে যা’ ছিলো, ‘আমি ব’ললাম।

‘মেয়েদের? কোন্ মেয়েদের? ও, তার..আচ্ছা তারা বড় হবে, আর আমাদের তারা ব্যবহার করবে না, সে জন্তে আমাদের জেবে দ্বিস্ত লাভ কি কোথায় আমরা যাবো? জানি না, ওতো একই কথা।’

“আমি জানি না ও আমি জানি—ওতে কোন তফাৎ নেই! চল

ডান দিকে যাওয়া যাক। ওদিকে নিশ্চয়ই সমুদ্র আছে।”

আমি ফিরলাম। আমাদের থেকে অনেক দূরে প্রান্তরে একটা কালো পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথায় সূর্য জলছিলো।

“তাকিয়ে দেখছো ও বেঁচে উঠেছে কিনা? তবু পেওনা, ওরা আমাদের ধরতে পারবেনা। আমাদের ওই ছাত্রটি চালাক ছোকরা। বেশ, শুঁছিয়ে নিয়েছে। চমৎকার কম্বোড, নিশ্চয়ই। ব্যাপারটার মধ্যে দিকি আমাদের ছেড়ে গেল। ই্যা ভাই, লোক ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। বছরের পর বছর তারা আরও অধঃপাতে যাচ্ছে—” সৈনিক দুঃখের সাথে বলতে থাকে।

নিম্নরূপ নিরালা প্রান্তরটা সকাল বেলায় উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় আগাদের সামনে অনারিত হয়ে আছে এবং দিগন্তের শেষে আকাশের সাথে মিশে গিয়ে একেবারে এক হয়ে গেছে। আলোটা কেমন স্নিগ্ধ এবং উদার। নীল আকাশের তলে বহুবিস্তৃত অবাধ প্রান্তরের মাঝে সমস্ত খাবাপ এবং অন্তায় কাজ অসম্ভব ব’লেই মনে হয়।

আমার ক্ষিধে পেয়েছে, ভাই,” সস্তা তামাক দিয়ে সিগারেট বানাতে বানাতে আমার কম্বোড বলে।

আমরা খাবো কি। কোথায়ই বা খাবো?”

“এটা একটা সমস্যা।”

*

*

*

এই কথা বলে গল্পকারক—একটা হাসপাতালে আমার পাশের সিটের শায়িত একজন লোক—উপসংহারে এই সব কথা বললেন এবং এইখানেই গল্পও শেষ হল। “সৈনিকটি এবং আমি দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলাম। ‘কারা’ দেশ পর্বন্ত আমি আর ও একসাথে যাই। সে একজন দক্ষলু অভিজ্ঞ এবং খাটি ভবঘুরে। তার উপর আমার খুব আস্থা ছিলো। এশিয়া মাইনর অবধি আমরা একসাথে ছিলাম, তারপর দুজনে...”

“সেই যিস্ত্রীটার কথা মনে আছে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“যেমন আপনি দেখেছেন, অথবা, শুনেছেন।”

“আর কিছু না?”

তিনি হাসলেন।

“তার সম্বন্ধে কি রকম ভাব আপনি আশা করেন? আমার ভাগ্যের জন্ত আপনি যেমন দোষী নন, তার দুর্ভাগ্যের জন্ত আমিও তেমনই দোষী ছিলাম না। কোন কিছুর জন্ত কেউ-ই দোষী নয়—কারণ আমরা সকলে একই রকম কতকগুলো পশু।”

— — —

জলাভূমি

আলেকজান্ডার কুপ্রিন

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ফিকে হ'য়ে আসছিলো। নিজার কোলে ঢলে পড়ছিলো বন। একটা থম্‌থমে গভীর নিস্তব্ধতা চারিধারে। বড় বড় পাইন গাছগুলোর মাথায় সূর্যাস্তের গোলাপী আভা তখনও রং মাধিয়ে রেখেছে—নীচে অন্ধকার, স'য়াত স'য়াতে। ধূপের নীরস উগ্রগন্ধ মিলিয়ে গিয়ে তার স্থানে ধোঁয়ার দুর্ব'হ গন্ধ দুয়ের দাবানল থেকে কর্মমুখর দিনটির কথা ভাসিয়ে নিয়ে আসছিলো। নিস্তব্ধ ক্ষততায় পৃথিবীর ওপর নেমে আসছিলো দক্ষিণের রাত্রি। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পাখীরা গান খামিয়েছে, শুধু কাঠচোকরার ঘুমজড়িত অবসাদগ্রস্ত চীৎকার ঝোপে ঝোপে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছিলো তখনো।

জামাকিন নামে একজন সার্ভেয়ার এবং একটা ছোট এষ্টেটের মালিক ম্যাডাম্‌ সার্ভুকভ নামে একজন বিধবার ছেলে ছাত্র নিকোলাই নিকলি-ভিচ তাদের কাজ থেকে ফিরছিলেন। সার্ভুকোভা বছর দুই এবং বহু সময় লাগবে ওখানে যেতে—সে জন্মে তারা গ্রহরী ট্রোপনএর সাথে বনের মধ্যে স্নাতটা কাটাতে ব'লে ঠিক করেন। ছোট পথটা গাছপালার তেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বের হ'য়ে দু-এক পা দূরেই একেবারে অনূশ্য হ'য়ে গেছে। কুশ এবং ঢাঙ্গা সার্ভেয়ার মাথা ঝুলিয়ে কুঁজো হ'য়ে হেঁটে চলেছিলেন—বছর-হাঁটায়-অত্যন্ত লোকের মত তাঁর চলনের ভঙ্গী। মোটা মোটা বেঁটে ছোট ছাত্রটি ওর সাথে ভাল বেধে ঝাঁটতে পারছিলেন না। সাদা টুপিটা তার ঘাড়ের গোড়ায় এসে প'ড়েছিলো। লালচে এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর এসে বুঁকে প'ড়েছে—ভিক্রে নাকের উপর তার বাকানো নাকী চশমা। গেলো বারের ঝরা-পাতার কার্পেটের উপর কখনও তার পা ফড়িয়ে বাজছিলো, কখনও বা পথের ওপরকার পাছের বের-করা

শিকড়ের সাথে তার পা গুতো খাচ্ছিলো। সার্ভেয়ার তার কষ্ট দেখছিলেন, কিন্তু চলার গতি কমাতে তিনি রাজী নন। তিনি ক্লান্ত, বিরক্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, এবং ছাত্রটার কষ্ট তাঁকে একটুখানি হিংস্রটে আনন্দ দিচ্ছিলো।

জামাকিনিকে নিয়োগ করেছিলেন ম্যাডাম সার্জকত তাব টুকরো টুকরো বনওয়াল। জমির একটা সোজা প্রাণ করবাব জন্তে। জমিটা গরুতে মাড়িয়ে নষ্ট ক'রছিলো, আর চাষীরা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর ছেসে নিকোলাং নিকোলিভিচ স্বেচ্ছায় তাঁকে সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলো। সহকারী হিসাবে যুবকটি মনোযোগী এবং পরিশ্রমী, আর স্বভাবের দিক দিয়ে গিন্ডক, উজ্জল, স্বচ্ছন্দ জীবনধাত্রাব পক্ষপাতী, অকপট এবং সদয়—যদিও স্বভাব তখন পর্যন্ত একটু ছেনেমি ধনণেব, যেটা লক্ষ্য কবা যেতো তার সরল হঠকারিতা এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের মণ্যে। সার্ভেয়াব একজন বয়স-ভারী লোক, নির্জনতাপ্রিয়, রুক্ষ এবং সন্দেহাতুর। সারাটা জেলায় সে মাতাল ব'লে পরিচিত ছিলো—ফলে, কাজ যোগাড় করতে তার অসুবিধা হ'তো এবং পেলো মাইনে পেতো অল্প।

দিনের বেলায় তিনি যুবক সার্জকতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তাব ভড়-বজায় রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলা দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে ক্লান্ত হওয়ায়, আর সারাদিন চীৎকার করে গলা ভেঙ্গে যাওয়ায়, বড্ড খিট-খিটে হ'য়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁর মনে হচ্ছিলো যে যুবক ছাত্রটির কাজের ওপর অমুরাগ এবং বিশ্রাম নেবার জায়গাগুলোতে চাষীদের সাথে তার খোশগল্প নিছক ভণ্ডামি—তার মা তাকে গোপনে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছে যাতে সার্ভেয়ার কাজের সময় মদ না খায় সেটা দেখতে। আর ছাত্রটা যে ভয়ানক বুদ্ধিমান যাতে করে সে এক সপ্তাহের তেতরই সার্ভের জটিল নৃত্যকে দখলে এনেছে এটা ও'র প্রাণে (যিনি তিন তিনটা পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন) একটা হিংসা এবং ঈর্ষার ভাব সৃষ্টি ক'রেছিলো।

এবং নিকোলিভিচের অদম্য বাচালতাও বৃদ্ধো লোকটিকে খুব বিরক্ত হবে ভুলেছিল। আরও বিরক্ত করেছিল তার তাকাত্মেজ যৌবন, তার পরিচ্ছন্নতা, তার চিত্তাকর্ষক সন্মান প্রদর্শনোপযোগী শিষ্টাচার বৃদ্ধিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বাধা বোধ করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের গোচরীয় বাধাক্য, তাঁর রক্ততা, তাঁর পিষ্ট-অস্তর আর নির্জীব অশুচিত ঈর্ষার অশ্রুত্বির দ্বারা।

দিনের সার্থে দ্বতই শেষ হ'য়ে আসছিল ততই রক্ত এবং বদমেজাজী হ'য়ে উঠছিলেন তিনি। নিবোলিভিচের এতে কোটি কোটি ভুল তিনি ইচ্ছা করেই বাড়িয়ে ব'লছিলেন এবং প্রতি পদে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছাত্রটির যৌবনের পুঁজি এত বেশী এবং এত অকুরক্ত তার সংপ্রকৃতি যে মনে হচ্ছিল, কোন রকম দোষ ধরতেই সে অপারগ। সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুলের দ্রুত ক্ষমা চাচ্ছিল সে, এবং জামাকিনের কঠোর তিরস্কারের জবাব দিচ্ছিল সে ঋন্থনিরে হেসে—যে হাসি অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গাছে গাছে। অনেকটা যেন সার্ভেয়ারের বিবাদাচ্ছন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেতে অসমর্থ হয়েই সে তাঁর উপর নানা প্রশ্ন এবং রহস্য বর্ণন ক'রছিলেন। তার আনন্দাংকুর, আনাড়ি অসঙ্গত সংপ্রকৃতির দ্বারা; যেমন করে একটা চকল কুকুরের বাচ্চা বৃদ্ধো একটা কুকুরকে বিরক্ত করে।

সার্ভেয়ার নত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকেন। নিকোলিভিচ তাঁর পাশে থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু গাছের সাথে গুঁতো খেয়ে এবং শিকড়ের সাথে হঠোই বাগ্নাতে প্রায়ই পিছিয়ে পড়ে সে এবং দৌড়ে গিয়ে পরে তার সঙ্গীকে ধরতে হয়। হাঁপিয়ে গেলেও জোরে জোরে উত্তেজিত ভাবে উদ্দীপ্ত অলভন্যী এবং অপ্রত্যাহিত চীৎকারের সাথে কথা বলে সে—তার কঠোর তজ্জাচ্ছন্ন অরণ্যের তেতর প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

“আমি বেশী দিন গায়ে থাঙ্গ করিনি স্যার আইভ্যানোভিচ,”

কণ্ঠধরে ভীতভা ঢালতে চেষ্টা করে সে, এবং স্থির বিশ্বাসের সাথে বৃকের ওপর হাত রেখে সে বলে, “আমি স্বীকার করি, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে আমি দেশটাকে চিনি না—কিন্তু এ পর্যন্ত যা’ কিছু দেখেছি তা’ এমন প্রাথমিক, গভীর এবং স্থানীয় ... অবশ্য, আপনি বলবেন যে আমি তরুণ এবং উদ্বিগ্নতাবের ... আমি সেকথা যেনে নিতে রাজী আছি, কিন্তু সুবিবেচক এবং বাস্তব লোক হিসাবে আমি চাই যে আপনি মানুষের জীবনটাকে দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখুন

সার্ভেয়ার অবজ্ঞার সাথে ঘাড়টা একটু উচু করে এবং একটুখানি ঝাঁকি লেগেছিল হাসি হাসেন, কিন্তু তিনি শাস্ততাব বজায় রাখেন।

“শুধু তাবুন, শ্রিয় এগর আইভ্যানোভিচ, প্রাচ্য জীবনের সব রীতিনীতির পেছনে কি ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব রয়েছে। একখানা নভেল, একটা বই, একটা কুনির, একখানা গাড়ী, কে এসব আবিষ্কার করেছিল, কেউই না। সমগ্র মানবজাত অর্জন করেছিলো এসব। এগুলো এখনযেমন, দু’হাজার বছর আগেও ঠিক এমনি ছিলো। একইভাবে মানুষ বীজ বুনেছে, লাঙ্গল চাষেছে এবং বাড়ী বানিয়েছে। দু’হাজার বছর আগে—কিন্তু কবে কোন স্থূর যুগে এই বিরাট কৃষিকর্মের উদ্ভব হয়েছিলো? আমরা এটা ভাবতেই সাহস পাইনে, শ্রিয় আইভ্যানোভিচ। এখানে আমরা সীমাহীন অসংখ্য শতাব্দীর ছয়রে হ’চোট খাচ্ছি। আমরা কিছুই জানি না কেমন করে এবং কখন মানুষ প্রথম গাড়ী বানায়? কত শত সহস্র বছর লেগেছিলো এই গঠনশীল কাজ শেষ করতে? শরতান জানে!” ছাত্রটি চোখের ওপর তাকাতাড়ি তার টুপিটা টেনে দিয়ে হঠাৎ প্রাথমিক চীৎকার করে বলে ওঠে, “আমি জানি না, এবং কেহই জানে নাযেটাই ধকন না কেন,—ক্যাপড চোপড, বাসন কোলন, জুতো, কোদাল, চরকা, বুরি—লক্ষ লক্ষ লোক যুগের পর যুগ সেগুলো পাবার

জন্তু মস্তিষ্ক চালনা ক'রেছে। মানুষের নিজের ওবুৎ আছে, তার কবিতা সাংসারিক জ্ঞান, নিজের হৃদয় ভাষা—সবই আছে; কিন্তু তা সম্বন্ধে আমি আপনাকে দেখাবো যে একটা নামও আমাদের হাতে এসে পৌছায়নি—একজন লেখকের নামও না! যুদ্ধ-জাহাজ এবং টেলিফোনের তুলনায় এটা হয়তো নগণ্য, কিন্তু বিশ্বাস করুন, একখানা পিচফর্কও আমাদের ওর চেয়ে বহুগুণ অতিভূত এবং অমুপ্রাণিত করে।

“টা-রা-রা, টা-লা-লা”, জামাকিন্ কৃত্রিম উঁচুস্বরে গান ক'রতে থাকে। হাতের এমন ভঙ্গী করে যেন মনে হয় ব্যায়েন অর্গ্যান চালাচ্ছে। “কল চলতে আরম্ভ ক'রলো। আমি আশ্চর্য হ'য়ে বাই তেবে যে আপনি ওতে ক্লাস্ত হন না! দিনের পর দিন একই ব্যাপার।”

“না, এগর আইভ্যানোভিচ্ শুনুন,” ছাত্রটি তাড়াতাড়ি বলতে থাকে। “কৃষক যে দিক্‌ই মন দিক্‌ না কেন, যাই সে দেখুক না কেন তার চারপাশে সব জায়গায় সেই পুরাণো সত্য—বয়োশুভ্র এবং প্রবৃদ্ধ সত্য। তার পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার উজ্জল—সবই সরল, স্বচ্ছ এবং বাস্তব। আরও মূল্যবান এইজন্য যে তার পবিত্রমেব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরো কোন প্রশ্ন নেই। একজন ডাক্তার, একজন বিচারক, অথবা একজন লেখকের কথাই ধরুন, এই সব উপজীবিকার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আশ্চর্যকর এবং অলীক। ধরুন একজন জানাতিমানী লোক, একজন জেনারেল, একজন সিভিল সারভ্যান্ট; একজন পুস্তক.....”

“নয়! ক'রৈ ধর্ম হস্তক্ষেপ ক'রবেন না—গম্ভীর ভাবে জামাকিন্ বলে।

“আমি ওই অর্থে বলিনি, এগর আইভ্যানোভিচ্,।” অধীরতার হাত নেড়ে সাড়ুকত বলে। “আপনার পছন্দ হ'লে, একজন ব্যারিষ্টার, একজন আর্টিস্ট, একজন গায়কের কথাই ধরুন। ওই সমস্ত মূল্যবান লোকের বিক্ষেপে বলবার আমার কিছুই নেই। কিন্তু তাদের প্রত্যেকই জীবনে একবার অস্বস্তি প্রাপ্ত ক'রে থাকবে, তার উপজীবিকাটি

মতবাদের অত্র অপরিহার্য ছিলো কিনা। একজন কায়রেক জীবন অপূর্ব সঙ্গতিশীল এবং সুস্পষ্ট। বসন্তে যদি তুমি বোন, শীতে তুমি খেতে পাবে। ঘোড়াকে খাওয়ালে, প্রতিদিন সে তোমাকে সাহায্য করবে। এব চেয়ে সোচ্চারে অথবা নিশ্চিত আর কি হ'তে পারে? কিন্তু এই বাস্তবমানুষকে তার সুস্পষ্ট জীবন থেকে বিছিন্ন করে ঘাড় ধরে ওই সত্যতার আলিঙ্গনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। অমুক অমুক আর্টিকল' এর ক্ষমতা দ্বারা, এবং কোর্ট অব এ্যাপালের অমুক অমুক সংখ্যার অনুসন্ধানের ফলে কৃষক সাইভোরোভ অমুক অমুক জমির মধ্য দিয়ে ছুটছুটি করার অল্প জমির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির আইনের বিরুদ্ধে দোষ ক'রেছে এবং এজন্য এই এই শাস্তি তাকে দেওয়া হ'লো। আইভ্যান্ সাইভোরোভ হৃদয় সঙ্গতভাবেই উত্তর দেয়, "ছদ্মব, আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা এই উইলো গাছের ধারে চাষ ক'রতেন যার ওখানে শুধু একটা খুঁটা আছে। কিন্তু তখন সাতঘরার এগর আইভানোভিচ্ ঘটনা হলে উপস্থিত হন।"

"দয়া করে আমাকে এর মধ্যে টানবেন না, জামাকিন্ বিরক্তির সাথে বাধা দিয়ে বলে।

"আচ্ছা, আমরা মার্ভেয়াব সার্ভুক'ই বলবো, যদি আপনারা ওতে বেশী সন্তুষ্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন, কম্পাস অল্পদায়ী আইভ্যান্ সাইভোরোভের সম্পত্তির সীমানা দক্ষিণপূর্ব দিকে চল্লিশ ডিগ্রী বা গুরুতম এর পাড় ঘেসে গেছে। অর্থাৎ আইভ্যান্ সাইভোরোভ্ আর তার ঠাকুরদা এবং ঠাকুরদার বাবা যে-জমিটা তাদের নয় সেটা চাষ ক'রেছে। আইভ্যান সাইভোরোভকে জেলে দেওয়া হয়, পেনাল কোডের সবগুলো ধারা অনুযায়ী; কিন্তু বেচারী কিছুই বোঝে না, ব'লে ব'লে শুধু চোখ মিট মিট করে। সে তোমার কম্পাসের চল্লিশ ডিগ্রীর কথা কি করেই বা বোঝে যখন মায়ের দুধ খাবার

সাথেই বেচারী ভেবেছে যে জমিটা কারও নয়, ভগবানের !”

জামা কিন গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, “আমার গায়ে কেন এসব নিক্ষেপ করছেন ?

“অথবা আর একটা কথা ধরুন—আইড্যান্ সাইভোরোভকে সৈন্য-দলে ঢোকান হয়, “সার্ভেয়ারের মস্তব্য লক্ষ না করে উৎসাহের সাথে সার্ভেভ ব’লতে থাকে—“এ্যাটেনশান! আইজ্ রাইট্! ড্রেস্ বাই দি রাইট্! এ্যাটেনশান্! সার্ভেণ্ট তাকে শেখায়। আমিও কয়েক মাস দেশের কাজ ক’রেছি এবং বিশ্বাস করতে রাজী আছি যে সামরিক কাজের জন্য এসব কলা-কৌশল প্রয়োজনীয় ; কিন্তু একজন কৃষকের কাছে এটা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। যাই বলুন না কেন, আশা ক’রতে পারেন না একজন শোক তার সহজ প্রাঞ্জল জীবন থেকে নিজেকে হিনিয়ে নেবে আপনার কথাগুণায়ী কাজ কববার জন্য এবং বিশ্বাস ক’রবে যে ওসব ভেড়ার সত্যিই কোন মূল্য আছে অথবা গুর পেছনে কোন অর্থ আছে। আগু ভেড়া যেমন ক’রে নতুন দরজার দিকে তাকায়, তেমনই করে সেও আপনার দিকে চাইবে।”

“আজকের মত এই কি যথেষ্ট হয় নি, নিকোলাই নিকোলিভিচ্?” সার্ভেয়ার জিজ্ঞাসা করে। সত্যি কথা ব’লতে কি, আমি এই সব কথাবার্তায় হাঁপিয়ে উঠেছি। আপনি নিজেকে একটা কিছু করে খাড়া করতে চান, কিন্তু আপনার কথায় কোনরকম অর্থ বা যুক্তি নেই। আপনি কি ভন্ জুয়ানের মতো আপনাকে দেখাতে চান? এসব কথাবার্তা কেন? সত্যিই আমি বুঝতে পারি না।”

একটা ঝোপের চারপাশে একবার চকর দিয়ে ছাত্রটি এক দৌড়ে গিয়ে সার্ভেয়ারকে ধরে।

“আজ সকালে আপনি বলেছিলেন, যদি আপনার মনে থাকে: হেঁ চাষা! হচ্ছে নির্বোধ, আলসে, নিষ্ঠুর। একটু স্থান্য সাথে আপসি

কথাগুলো বলেছিলেন, ফলে আপনার বতটা স্মারপরাগ হওয়া উচিত ছিলো ততটা হতে পারেন নি। কিন্তু প্রিয় এগর আইভ্যানোভিচ্, আপনি কি বোঝেন না যে কৃষক আমাদের থেকে আলাদা ক্ষেত্রে বাস করে। কষ্টেই সে তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছেছে, যখন আমরা চতুর্থ স্তরের কথা ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছি। কেমন করে আপনি বলেন যে কৃষক নির্বোধ? আ বহাওয়া সম্বন্ধে, তার ঘোড়াটার সম্পর্কে, খড়কাটার বিষয়ে ওর কথাবার্তা আপনাকে শুনতেই হবে। ওসব কথা অপূর্ব। প্রত্যেকটি কথাই সরল তাৎপর্যমূলক, অর্থবাহক এবং উপযুক্ত...কিন্তু সেই কৃষককেই আপনাকে একটা গল্প বলতে বলুন, কি ভাবে সে থিয়েটার দেখতে সহরে গিয়েছিলো, শুঁড়িখানায় কি চমৎকার সময় কাটিয়েছে—যেখানে একটা ‘থ্যারেল-অর্গ্যান’ বাজানো হচ্ছিলো, দেখবেন কি জঘন্ত উক্তি, কি হাস্যকর-কুৎসিত কথা সে ব্যবহার করে। সেটা শুনতে তদ্বন্দ্ব।

“ছাত্রটি একটু খেমে হঠাৎ যেন আবেগে জানিয়ে চীৎকার করতে থাকে—যেন বনটা লোক পরিপূর্ণ হ’য়ে গিয়েছে এবং সকলে তার কথা-বার্তা শুনছে! আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে কৃষক দবিত্র, ক্লান্ত, নোংরা—কিন্তু তা’কে বিভ্রামেব সময় দাও। অবিরল পেষণ তাকে ছিন্নভিন্ন ক’রে দিয়েছে। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সে বিদীর্ণ। তাকে খেতে দাও, তা’কে বন্ধা কর, লেখাপড়া লেখাও তা’কে, কিন্তু তোমার চতুর্থ স্তর দিয়ে তাকে চর্চা ক’বো না। আমি স্থিরভাবে বুঝছি, যে জনসাধারণকে জানের আলো না দেওয়া পর্যন্ত তোমার আপীল-কোর্টের সব গবেষণা, তোমার কম্পাস, সব দলিলপত্র, সব গোলামি তার কাছে নির্জীব শব্দরাশিতেই পরিণত হ’বে।”

জামাকিন্ হঠাৎ খেমে গিয়ে ছাত্রটির দিকে ফিরে দাঁড়ায়। “নিকোলাই “নিকোলিভিচ্, আমি তোমাকে চুপ করতে বলছি!” একজন বুড়ো মেয়েলোকের মত দুঃখান্বিত স্বরে সে বলে ওঠে। “তুমি

এতো ব'কেছো যে আমার দৈর্ঘ্য শেষ সীমায় গিয়ে পৌছেছে। আমি আর গুনতে পারি না—আর গুনতে চাইও না! যতদূর মনে হয়, তোমার সাধারণ-বুদ্ধি আছে, অথচ তুমি এতো সোজা ব্যাপারটা বুঝতে পারো না। বাড়ীতে, অথবা বজু-বাঙ্কবের ভেতর তোমার মত প্রচারের স্বযোগ আছে। আমি তোমার বজু নই। তুমি যা' তুমি তাই—আর আমি যা আমিও তাই। আমি এসব কথাবার্তা পছন্দ করি না। আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে.....”

নিকোলিভিচ, তাই নাকী চশমার উপর দিয়ে প্রাথমিক দৃষ্টিতে জামাবিনের দিকে চায়। সাতেরারের মুখটা অস্বাভাবিক, সামনের দিকটা স্ফীর্ণ, নরম এবং ছুচুলা, কিন্তু পাশ থেকে চওড়া এবং চ্যাপ্টা দেখা যায়—অর্থাৎ মুখখানায় সামনের দিকটা নেই ব'লেই চলে আর তার নাকটা বিমর্ষ এবং বিমল। শুদ্ধ নম্র গোথুলির আলোয় ছাত্রটি এই মুখে এমন একটা অবসাদ এবং জীবনের ওপর বিতৃষ্ণার ছাপ দেখলে যে তার ভেতরটা দুঃখে বিদীর্ণ হতে লাগলো এবং আকস্মিক অন্তর্দৃষ্টির ফলে কঠোর স্পষ্টতায় সব তুচ্ছতা, বাধা এবং অর্থহীন কদর্ব স্বভাব—যা হতভাগ্য লোকটার নিরালা আত্মাকে পরিপূর্ণ ক'রে রেবেছে তা সে অনুভব করতে পারল।

“রাগ করবেন না এগর আইভ্যানোভিচ”, নরম প্রীতিপূর্ণ ভাষায় সে বললে। “আমি কোন রকম আঘাতের উদ্দেশ্য নিয়ে বলি নি। আপনিই একটু থিট্‌থিটে।

“থিট্‌থিটে, থিট্‌থিটে”, অর্থহীন ঈর্ষাপ্রসূত স্বরে জামাকিন সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে। “এক সময় আমি থিট্‌থিটে ছিলাম না। কিন্তু আমি এসব কথাবার্তা পছন্দ করি না, ব'লছি তোমাকে .. তোমার কাছে কি রকম সাধী আমি হতে পারি? তুমি একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক—আর আমি কি? আমি? খুসর ছাত্রময় একটা জীব বইতো নয়।”

ভ্রমরুক্ত হ'য়ে ছাত্রটি চূপ ক'রে যায়। কল্পতা এবং অবিচারের সম্মুখীন হলে সে সব সময়ই বিহীন হ'য়ে পড়ে। সার্ভেয়ারের পেছনে পড়ে সে ওর পিঠের দিকে ডাকিয়ে নীরবে হাঁটতে থাকে। লোকটার বাক্য, সঙ্গীর্ণ এবং শক্ত পিঠটাও তার অর্থহীন হতভাগ্য জীবন, নিয়তির রুঢ় আঘাত, তার একরোখা জঘন্য আত্মদ্বার কথ্য নীরবে প্রকাশ করে।

বনের মধ্যে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো আলো থেকে অন্ধকারের ধীর রূপান্তরের মধ্যে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়ে, পাছলোর অভূত চেহারা নির্ণয় করতে পারছিল। একটা শব্দ অথবা প্রতিবিম্ব কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দূর প্রান্তর থেকে বয়ে-আসা বাতাস ঘাসের রিদ্ধ গন্ধে ভরপুর।

পথ নীচুর দিকে নেমে গেছে। একটা ঝাঁকে ভিজে ঠাণ্ডার একটা ঝলক যেন মাটির গভীর তলের কোন গর্ত থেকে আসছিল—সেটা ছাত্রটির মুখে এসে লাগে।

"সাবধানে চল। এখানে একটা জলা আছে" জামাকিন্ না ফিরেই হঠাৎ বলে ওঠে। নিকোলিভিচ লক্ষ্য করে যে তার পায়ে কোন শব্দ হচ্ছে না যেন একটা নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে সে মাড়িয়ে যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট ঝোপের সার। তার চার পাশে ভালপালা আঁকড়ে আছে। মাঝে মাঝে কল্পিত, সাদা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুয়াশার মেঘের টেউ। একটা অভূত শব্দ হঠাৎ বনের তেতর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী ক্ষীণ এবং চন্দ্রোবদ্ধ করুণ স্বরে ওটা পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছিল। ছাত্রটি আতঙ্কে খেঁদে যায়।

"ওটা কি?" কল্পিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে।

"একটা বক," সার্ভেয়ার সংক্ষেপে উত্তর দেয়। "চল তাজাতাভি হাঁটা বাক, এখানে একটা ঝাঁক আছে।"

কিছুই দেখা যায় না তারপর। ডাইনে এবং বাঁয়ে কুয়াশা একটা ভারী সাদা পর্দার মত কুলছিল। ছাত্রটি অসুভব করলে যে ওর অগকণা তার মুখে এসে লাগছে। ওর সামনে একটা কালো চকল বিন্দু—সার্ভেরারের পিঠ—এগিয়ে চলেছে সে। পথ অদৃশ্য, কিন্তু তাব ছ'পাশেই যে জলাভূমি আছে সেটা বোঝা যায়, এবং ও থেকে শুকনো শাপলা আর তিজের ব্যাঙের ছাতার উগ্র গন্ধ ওঠে। বাঁখটা নরম এবং পাথরের নীচে তুলতে থাকে—আর প্রতি পদে চট্‌চটে কাদা ওথেকে বেড়োতে থাকে।

সার্ভেরার খেয়ে যায়। তার পিঠে গিয়ে গুতো খায় সাঁড়ুকত।

“দেখো, পা পিছলে যাবে কিন্তু!” জামাকিন্ গজ্ গজ্ করতে থাকে। “তুমি বরং অপেক্ষা করো, আমি পাহারাদারকে ডাকি। দম নিলেই ওই অতিশয় কাদার ভেতর পুঁতে যাবে।”

মুখের ওপর হাত বেখে সে একটানা এগাটা চাঁৎকার দেয় “টেশান্-ন্!”

নরম কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়ে গলার ২য় অক্ষুট এবং ছন্দোহীন হয়ে যায়—যেন জলাভূমির তিজের বাষ্প সেটা লেপ্টে গেছে।

“দুস্তোর! তুমি জানোই না কোথায় পা দিতে হয়!” সার্ভেরার গর্গ গর্গ করতে থাকে, দাঁত ভীষণভাবে কড় মড় করতে থাকে। আমার মনে হয় আমাদের একই ভাবে গুটিহুটি মেরে থাকতে হবে। টেশান্!” বিরক্তিতে এবং খেদে সে চাঁৎকার করতে থাকে।

“টেশান্-ন্!” কাকা এবং খাদ সুরে ছাত্রটি একবার ডাকে।

পরিষ্কারে তারা বহুক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পর কিছু দূরে আকার-বিহীন এক কালক হলদে আলো কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা যায়। সেই উজ্জল আগগাটায় বিরাট একটা ছায়া পড়েছে। একজন বেঁটে লোক টিনের একটা লঠন হাতে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেড়িয়ে আসে।

“এই যে,” প্রহরী লঠনটা উঠুতে তুলে ধরে বললে, “আর আপনার সাথে উনি কে? মাটির সাঁড়ুকত, না?”

“নমস্কার, নিকোলাই নিকোলিভিচ্। মনে হয়, রাস্তিরে থাকবেন, না? একেবারে অব্যবহৃত স্থান। আমি ভাবছিলাম, কে ডাকতে পারে, কিন্তু দরকার যদি হয়, এই ভেবে বন্ধুটাকে সাথে নিয়েছি।” লণ্ঠনটার হৃদয়ে আলো টেপানের মুখে পড়ায় অন্ধকারের পাশে সেটাকে বেশ তৃপ্তিকর মনে হচ্ছিলো। মুখটা হালকা, কঁকড়া নরম চুপে ভর্তি— দাড়ি গোঁক আর ভ্রুর চুলে। তার নীল ছোট ছোট চোখ দুটো ঘন জ্বলের মাঝ থেকে উঁকি মারছে এবং চারপাশে ছোট ছোট রেখার বৃত্ত তার মুখে ক্লান্ত এবং হাল্কা শিশুর মত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলো।

“চলুন আমরা যাই,” বলে ফিরে দাঁড়িয়ে সে কুয়াশার মধ্যে অদৃষ্ট হয়ে গেলো। তার লণ্ঠনের বড হৃদয়ে আলোর ছোপটা নীচে মাটির ওপরে কাঁপতে থাকে—পথের ছোট একটা অংশকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।

“এখনও কাঁপছে, টেপান?” জামাকিন্ ওর পেছনে চ’লতে চ’লতে জিজ্ঞেস করে।

“হ্যাঁ, এগর আইভ্যানোভিচ্,” দূর থেকে টেপান উত্তর করে। দিনের বেলা তত মন্দ নয়, কিন্তু রাত এলে কাঁপুনি আসে। কিন্তু আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এগর আইভ্যানোভিচ্।”

“মেরিয়া কি একটু ভালো?”

“না, আমি ‘না’ বলতে দুঃখিত। স্ত্রী-ছেলেমেয়েগুলো সবাই খারাপ। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ছোট শিশুটা ভালো আছে, অবশ্য সময়মত সেও এটা পাবে। আর তোমার ছোট ধর্মছেলেকে আমরা গত সপ্তাহে নিকোলস্কির কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম... এই নিয়ে আমরা তিনটা কবর দিলাম... দেখি আপনার পথে আলো খরি এগর আইভ্যানোভিচ। খুব সাবধানে চলবেন এখানে।”

নিকোলিভিচ লক্ষ্য করলে, পাহারাদারের ঘর খুঁটির ওপর তৈরী—
মেঝে আর মাটির মধ্যে পাঁচ ফিট জায়গা রয়েছে। কয়েকটা ট্যারা
বাঁকা সিঁড়ি দরজা অবধি গিয়েছে। পথটা আলো করবার জন্য টেপান
মাথার ওপর লণ্ঠনটা উঠায়। ছাত্রটি ওর পাশ কাটিয়ে ঘাবার সময় লক্ষ্য
করে যে সে আগাগোড়া কাঁপছে এবং তার ধূসর ইউনিফর্মটার কলারের
নীচে নিজেকে সে জড়োপড়ো করে রেখেছে।

খোলা দরজা দিয়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে—রুখান পল্লীতে যেটা সাধারণ
ব্যাপার—চ্যান্ করা চামড়ার কোট আর সেকা কুটির টকগন্ধ ওর
সাথে মেশান। সার্ভেয়ারই প্রথম ঢোকে দরজার কবাটের তল দিয়ে
নীচু হয়ে।

“নমস্কার মিষ্ট্রেস্!” অকণ্ট সদাশয়তায় সে টেপানের জীকে
সম্বাদনা জানায়।

খোলা টোভটর পাশে-দাঁড়ানো ট্যারা একজন স্ত্রীলোক এর দিকে
সামান্য একটু কিরে ওর দিকে না চেয়েই স্থান ভ্রিয়মানতায় নীরবে অস্তি-
বাদন জানায়—তারপর চুল্লীর পাশে গিয়ে তন্ন তন্ন করে জিনিসপত্র
গুলটাতে-পালটাতে থাকে। টেপানের ঘরখানা বড় কিন্তু নেংরা,
ঠাণ্ডা এবং উন্মুক্ত আর একটা পরিত্যক্ত মস্তম্বাবাসের মত ওটাকে মনে
হয়। কাঠের প্রাচীর বরাবর দরজার সামনের কোণটার কতকগুলো সুরু
লম্বা বেঞ্চ রয়েছে—বসার বা শোয়া হুঁয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। কোণটার
অনেকগুলো কালো কালো ছবি টাঙানো এবং তার ডাইনে-বাঁয়ে কতকগুলো
পরিচিত কাঠে খোলাই ছবি, যেমন “শেষ বিচার” বাতে অসংখ্য
সবুজ দৈত্য দানব আর ভেড়া-মুখো দেবদূতের ছবি, “বড়লোক এবং
ল্যাকারাসের উপদেশাত্মক গল্প”, তা ছাড়া “মহা জীবনের সিঁড়ি,”
“একটা কপীরা আমোদ ক্ষুতির দৃশ্য,” এবং ওর বিপরীত দিকের
কোণটার একটা টোভ—যেটা ঘরের এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল

করে আছে। ওর ওপর থেকে দুটা ছোট ছেলের মাথা ঝুঁলছে; চুল তাঁদের রোক্তম্বাত; সাদা ধবধবে—গায়ে-বেড়ে-ওঠা ছেলেদের মধ্যেই ‘খুঁ বা’ দেখা যায়। পেছনের দিককার দেওয়ালটার পাশে একখানা ডবল বিছানা, তাতে লাল ছাপাই চাদর। ছোট দশ বছরের একটা মেয়ে বসে পা দোলাচ্ছিলো—তার বড়ো বড়ো উজ্জল চোখ দুটো আগন্তুকদের দিকে আগ্রহীয় স্থির হয়ে আছে।

ছবিগুলোর নীচে কোণটার মত একটা খালি টেবিল। ওর ওপরে সিলিং এর উপর থেকে একটা হকে-ঝুলানো জরাজীর্ণ একটা লঠন, তাতে মলিন চিমনী। ছাত্রটি টেবিলের ধারে বসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা অবসাদ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মনে হচ্ছিলো তার সে যেন ওই জায়গায় কৃত্রিম আলোস্ত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছে। লঠনের প্যারাকিনের গন্ধ তার মনে কোন অতীত অম্পট স্মৃতি জাগিয়ে তোলে! এটা কি স্বপ্ন অথবা পূর্বস্মৃতি? কখন এবং কোথায় এটা ঘটেছিল? মনে হচ্ছিলো একটা ফাকা বাক্য এবং প্রতিধ্বনিত কণ্ঠ সে বসে আছে—কক্ষটা দরদাসানের মত। একটা বাতি খোঁজ উগ্র প্যারাকিনের গন্ধ আসছে, আর দেওয়াল থেকে চুল্লীর উপরকার কড়াটার উপর টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। একটা প্রচণ্ড অবসাদে সার্বকালের মন পূর্ণ হয়ে যায়।

“আমাদের জন্ত কি সামোভারটা ঠিক করতে পারবে ষ্টেপান, আর একটা ডিমের তৈরী কিছূ?” জামাকিন শুধায়।

“এহুনি, এগর আইভ্যানভিচ, এহুনি,” ষ্টেপান্ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

“মেরিয়া”—অনিশ্চিতভাবে সে তার দ্বীপ দিকে চায়, ভূমি কি সামোভার ঠিক করে ফেলতে পারবে না! তব্রলোকরা একটু চা খেতে জান্!”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাঁরা যা বলেছেন আমি শুনেছি,”—মেরিয়া বক্তৃতাকে উত্তর করে। সে দরদালানে চলে যায়। দার্তেরার সেই মুষ্টিটাক সামনে গিয়ে জুসু একে টেবিলের উপরে গিয়ে বসে। টেপানু তাদের থেকে দূরে দরজার কাছে, যেখানে জলের একটা বাসতি আছে, সেখানে একখানা বেকের একধারে গিয়ে বসে।

“আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম ভেবে, কে ডাকতে পারে, “নশ্রভাবে সে আরম্ভ কবে, “আমাদের ফরেস্তার বাবু কি? আমি ভাবলাম। কিন্তু রাস্তির বেলা তাঁব কি দরকার? তিনি এখানে চিনে আগতে পাবেন না। তিনি নিশ্চয়ই একজন অভূত ভদ্রলোক। আমাদের সকলেব কাছে তিনি সৈন্তদের মত চালচলন প্রত্যাশা করেন। এটা তাঁকে ভারী আনন্দ দেয়। বন্দুক নিয়ে গিয়ে তুমি রিপোর্ট কর, “কর্তা, আমাব প্রহরাব বেলায় বনের মধ্যকার চেরনাটনক্ষীর বাড়ীতে সব ঠিক ঠাক ছিলো... ..ওসব সম্বন্ধে তিনি একজন খাঁটি লোক। মেয়েদেব যে তিনি সর্বনাশ করেন, অবশ্য, সেটা আমাদের ব্যাপার নয়

চুপ করে সে। দরদালানে মেরিয়াকে সামোতারে সশব্দে কয়লা ফেলতে শোনা যায়। ঠোতের ওপর থেকে ছেলেমেয়েগুলোর গভীর নিঃশ্বাস প্রবাসের শব্দ শুনেতে পাওয়া যাচ্ছিলো। দোলনাটা একঘেয়ে আতর্নাদ করছে চলেছে। বাড়ুকক একটু মনোযোগ দিয়ে বিছানার ওপরকার ছোট মেয়েটার মুখের দিকে চায়। ওর চপল সৌন্দর্যের চুল্লিত বিকালে ও বিস্তৃতই হয়। গাল দুটো একটু কোলা হলেও বেশ নরম এবং কমণীয়—স্বন্দর স্বচ্ছ চীনা মাটির ওপরকার ছবির মত। স্বন্দর বড়ো বড়ো চোখ দুটো অগাভাবিক উজ্জল। অপ্রমদ অকৃত্রিম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে—রাফেলের আগ্নেয়াস্ত্রের ছবির মেয়েদের চোখের মত।

“তোমার নাম কি গুঁকি?” ছাত্রটি মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করে। হাত

দিয়ে খুঁচটা সে ঢেকে ফেলে, এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যায়।

“ও লাফুক,” টেপান চীৎকার করে বলে। “তব্ব কী তোমার বোকা মৈয়ে? সে একটু অভুত শিষ্ট হাসি হাসে, ফলে তার সবটা মুখ দাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হ’য়ে গিয়ে তাকে একটা সজাকর মত দেখায়। ওর নাম ভেরিয়া। তব্ব পেওনা বোকা যেয়ে। তব্বলোকটি তোমাকে সারবেন না,” মেয়েটাকে সাস্বনা দেবার মত চেঁচায় সে বলে।

“ওর কি ব্যারান?” নিকোলিতিচ জিজ্ঞেস কবে।

“কি?” টেপান প্রশ্ন করে। ঝোপের মত তার মাথার চুলগুলো হুঁতাপ হয়ে যায়, এবং আর একবার তার নিম্ন ক্রান্ত দৃষ্টি ছুই দিকে চেয়ে থাকে। আপনি কি জিজ্ঞেস করছিলেন সে রোগী কিনা? আমাদের সবাই রোগী! স্ত্রী, ঠোঁতের ওপরকার ছেলেগুলো, সবাই। তৃতীয় জনকে আমরা মজলবারে কবর দিয়েছি। আপনি তো জানেন জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে—ওটাই আসল কারণ। আমরা কাঁপি আর কাঁপি এবং ঠিক সময় আবার ছেড়ে যায়।”

“আপনাবা কিছু খাননা কেন ওর জন্যে?” একটু মাথা নেড়ে ছাত্রটি প্রশ্ন করে। “আমাদের ওখানে যাবেন কিছু কুইনাইন দেবো আমি।”

“ধন্যবাদ আপনাকে নিকোলিতিচ—তব্ববান আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আমরা বছবার অনেক কিছু খেয়েছি, কিন্তু তার ফল কিছুই হয় না” নিরাশতরে হাত দুটো ছোঁড়ে টেপান। আমরা তিনজনের কবর দিয়েছি ওই জলাটার অন্তে এখানে স্যাঁতসেঁতে, এবং বাতাসটাও তারী আর বন্ধ।”

“অন্ত জায়গায় যাও না কেন?”

“কি?” অন্ত জায়গার কথা বলছেন? ঝোপটার পুনরুজ্জীবিত করে টেপান। মনে হচ্ছিলো, তাকে যা’ বলা হচ্ছিলো সেদিকে মন দেবার

অন্ত তাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছে। প্রত্যেকটি কথার সাথে তাকে উজ্জ্বল ঝেড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে।

এখান থেকে নড়া অবশ্য ভাল মশাই, কিন্তু তবু একজনকে তো এখানে থাকতেই হবে। বাড়ীটা বড়ো আর একজন পাহারাদার না রাখলেও ওদের চলে না; আমরা না হলে অন্য কেউ একজন নিশ্চয়ই... .. আমাদের আসার আগে গালাকশানু পাহারাদার এখানে থাকতো। বেশ বুদ্ধিমান লোক সে, বেজায় খাধানচেতা.....প্রথম সে, তার দুইটি ছেলেকে কবর দেয়, তারপর স্বীকে, শেষে নিজেকে মরে। কোথায় তুমি বাস কর, সেটা বোধ হয় প্রশ্ন নয়। আমাদের স্বর্গের পিতা জানী। আমরা কোথায় থাকবো এবং কি ক'রবো, সেটা তিনিই ভাল বোঝেন।”

মেরিয়। দরজা খুলে আবার হাতের কলুই দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে সামোভার নিয়ে আসে।

“ওভাবে বসে থাকা বেশ চমৎকার।” টেপানের উপর সে চটে উঠে।

অন্তত কাপগুলো তো ঠিক করতে পারতে।

সে প্রচণ্ডভাবে টেবিলের উপর সামোভারটা রাখে। তার অকাল-বার্ধক্যের ছাপপড়া মুখটা শীর্ণ এবং ক্যাকাসে। তার গালে ছোট ছোট ত্রণের জালির নীচে দুটো রাঙা দাগ। চোপ দুটো অস্বাভাবিক রকম ঝকঝক করে। ঠিক ওই রকম কষ্ট ভরীতে সে কাপ, রেকাবী এবং কুটি টেবিলের উপর হুঁড়ে দেয়।

সাদু কত চা খায় না। সেদিন সে যা কিছু দেখেছে বা শুনেছে তাতে হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে সে। সার্ভেয়ারের অর্থহীন নীচহিংসা, নির্ভর রহস্যময় ভাগ্যের সামনে টেপানের শান্ত বিনয় তার জীবনীর নীরব গোধ, জলাভূমির জরে ছেলেগুলোর অবসর একটার পর একটা মরে যাবার দৃশ্য সব মিলে তাকে একেবারে অবসর ক'রে ফেলে। ঠিক যেনকম জীৱ অসহায় অবস্থা আমরা বোধ করি যখন আমরা একটা কয়

কুকুরের বুকি উজ্জল চোখের দিকে তাকাই, অথবা একটা নিবোঁদের ককণ চোখ দেখি কিংবা যখন আমরা নিরীহ নরনারীর হৃৎকষ্ট অত্যাচার এবং বিধাস্বাতন্ত্র্যের কথা শুনি অথবা পড়ি।

সার্ভেয়ার কাপের পর কাপ চা খায়। বিরাট এক চাকলা ঝুটি থেকে একটা বড় গ্রাস ঝুটি ছিড়ে নিয়ে সে লুপ্তভাবে পেতে থাকে। খাবার সময় তার গালের হাড়ের উপর মাংসপেশীগুলো দড়ির মত নড়াচড়া ক'রতে থাকে। তার স্তিমিত উদাসীন চোখ দুটো জানোয়ারের মত সোজা চেয়ে থাকে। অনেক বলা কলঙ্কার পর সমস্ত পরিবারের মধ্যে ষ্টেপান এক কাপ চা খেতে রাজী হয়।

ধীরে ধীরে এবং বহুকষ্টে সময় গড়িয়ে চলে। সার্ভেয়িং বিস্তৃত হয়ে ভাবে আরও কত দীর্ঘ স্তিমিত সজ্জা দেখা যাবে এই ঘরটায় বার সিন্ধুতা এবং বিধাক্ত কুশাশা সমুদ্রের ছোট একটা নিরীহ বীপের মতই অসহায়। নিজে আসা সামোভার হঠাৎ হৃদয় করণ করে শুধুনিয়ে উঠে—ব্যাপক নৈরাশ্য এবং হতাশারই প্রতীকশি শুঠ। দোলনাটা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ বন্ধ করেছে। মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময় অন্তর শুধু একটা কিংকি পোকা তার একঘেয়ে-তজ্জাজ্জানো স্বরে গান ক'রতে থাকে। বিছানার ওপরকার ছোট মেয়েটা তার হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে চিন্তিত ভাবে আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে—যেন গোহাঙ্কুর হয়ে আছে সে। তার বড়ো বড়ো অপার্থিব দৃষ্টিওয়ালা চোখ দুটো আরও বিফারিত, মাধাটা তার নিম্পূহ এবং অহুভুতিহীন তঙ্গীতে একপাশে নোহানো। একভাবে আলোর দিকে তাকিয়ে কি সে ভাবছে, কি সে অহুতব করছে, মাঝে মাঝে তার পাতলা হাত দুখানা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্তভাবে এলিফে পড়ে, এবং এই সময় তার চোখ দুটো অজুত, অবর্ণনীয় হৃদয়, শিত এবং প্রত্যাপী হাসিতে জলে উঠে—বাত্তির নিশ্চকতা এবং অকৃত্যর যেন তার অস্ত্রে মধুর একটা প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে—বা অস্ত্রের কহুহু

অজ্ঞান। এবং একটা গোলমেলে অন্ধ চিত্র। যেন ছায়াটির মাধ্যম
দেখে। জীব কাছে মনে হয় পরিবারটা যোগের রহস্যময় শক্তির
মুঠোর অবাক হয়ে পড়েছে। মেয়েটার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটোর
দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে ভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অস্তিত্ব
তার ক্ষেত্রে কিনা। ধীরে ধীরে উদাসীনতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ দিম-
গুলো তাদের স্বাভাবিক উদ্বেগ, বিশৃঙ্খল গোলমাল, হুড়োহুড়ি এবং
ক্লাস্তিকর আলো নিয়ে এগিয়ে আসে। সন্ধ্যা আসে আর সে তার চোখ
দুটোকে বাতির ওপব স্থির রেখে ক্লাস্ত অপর্ণে রাতের প্রতীক্ষা করে
—যখন সেই দুঃস্বপ্ন বাতির তীব্রতা তার ছোট দেহটাকে বিপর্যস্ত
করে দিয়ে যায়, তার ছোট মস্তিষ্কটাকে আচ্ছন্ন করে কেলে এবং হ্রস্ব
মধুর এবং বেদনাকর স্বপ্নে তাকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়।

বহুদিন আগে সাতু'কত কোন এক জায়গায় একজন প্রসিদ্ধ আর্টিষ্টের
“ম্যালেরিয়া” নামক ছবি দেখেছিলেন। জলজ লিলি ফুলে তাকওয়া একটা
জলার ধারে ছোট্ট একটা মেয়ে শুয়ে ছিলো এবং যুগের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে
দুলছিলো। জলাটার ভেতর থেকে একটা মেয়ে বড়ো বড়ো অশান্ত চোখের
দৃষ্টি মেলে ধীরে ধীরে মেয়েটার কাছে আসছিলো। তার জামা কাপড়
কুয়াসায়ে মিলিয়ে গিয়ে শাতলা হয়ে বাওয়ায় তাকে ঠিক প্রেতের মত
দেখাচ্ছিল। সাতু'কত ইঠাম্ সেই বিস্মৃত ছবিটার কথা মনে করে একটা
চকিত রহস্যময় আতঙ্কে মুগ্ধমান হয়ে পড়ে, যেন তার পিঠের ওপর দলে
আচমকা একটা ঠাণ্ডা বরফ চলে গেল।

চোয়ার ছেড়ে উঠে সাতেরার জিজ্ঞেস করে, “আমাদের বিছানাটা
একটু ঠিক করে দেবে মেরিয়া?”

প্রত্যেকেই উঠে পাড়ায়। ছোট মেয়েটা মাথাটা হাত দিয়ে ধরে
সটাক শুয়ে পড়ে। চোখটাকে আধ বোজা করে রাখে সে, এবং একটা
খুশীভরা স্বপ্নময় হাসি তার চোটে খেলা করতে থাকে। হাই তুলে

এবং মোড়ামোড়ি ছেড়ে মেরিয়া বাইরে গিয়ে ছ'বোঝা বড় নিয়ে আসে। সুখের কক্ষতা তার মিলিয়ে গিয়ে চোখ দু'টো বিন্দু হয়ে উঠেছিলো। ক্লান্ত অধীর প্রত্যাশার একটা অদ্ভুত তাব প্রতিচ্ছায়া ফেলেছিলো ওর ওপর।

বখন সে বেকগলো টেনে সরিয়ে ঘর সাফাচ্ছিলো, তখন নিকোলিভিচ কাইরে দরজার চোকাঠের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। তার চারদিকে কিছুই দেখা যায় না, শুধু ঘন ঘনর সজল কুয়াসা এবং যে খাপটার ওপর সে দাঁড়িয়েছিলো—মনে হচ্ছিলো সমুদ্রে নৌকার মত সেটা ওর ওপর ভাসছিলো। ঘরের মধ্যে ঢুকলে ওই জলাভূমির হৃদয় কুয়াসায় তার সুখ, চুল, কাপড় চোপড় সব স্যাংসেতে এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ছাত্র এবং সার্ভেয়ার দু'জন বেঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ে। টোভের খারে মেঝের ওপর একটা বিছনা পেতে ফেলে টেপান। ল্যাম্পটা সে নিভিয়ে দেয় এবং অনেকক্ষণ ধরে তার ফিস ফিস প্রার্থনা শোনা যায়। তারপর সে শুয়ে পড়ে; নিঃশব্দ পদসন্ধারে মেরিয়া বিছানার কাছে যায়। ঘরটা নিরুন্ম মেঝে পড়ে থাকে। একঘেয়ে ঝিমিয়ে-পড়া স্বরে ঝিঁ ঝিঁ গান গেয়ে চলে, পোকাগুলো বিচ্ছেদহীন ক্লাস্তিকর অভিযোগের মৃদু গুঞ্জন তুলে জানালার সার্সীতে এসে মাথা ঠুকতে থাকে।

ক্লাস্তি সবেও সাদৃশ্যকর ঘুমাতে পারে না। খোলা দৃষ্টি মেলে চিং হয়ে পড়ে থেকে সে সতর্ক আওগাজ শুনতে থাকে—বিনিত্র তিমির রাতে যা অদ্ভুত আকার ধারণ করে। সার্ভেয়ার অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়ে। ইঁ করে খাস প্রবাসের কাজ চালায়। তার নিঃখাস গলার একটা পাতলা আবরণ তৈরি করে ঘর ঘর শব্দে বেরিয়ে আসে বলে বোধ হয়। বিছানাঃখ মাঝের পাশে শোওয়া ছোট্ট মেয়েটা কতকগুলো অশ্রুট শব্দ করে। টোভের ওপরকার ছেলেমেয়েগুলো খুব ঘন ঘন এবং গভীর খাস প্রবাস বনয়—যেন তাদের ঠোঁট থেকে তীব্র জ্বরের উদ্ভাপ উড়িয়ে দিতে চায়। প্রতি নিঃখাসের সাথে টেপান শাস্ত করণ একটা শব্দ করে।

“মা, একটু জল।” একটা যুগন্ত ছেলে আবিষ্কারের স্বরে জল চায়।
মেরিয়া বিনা প্রতিবাদে বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে খালি পায়ে কট কট
শব্দ করে ঘরের মাঝ দিয়ে বালতির দিকে যায়। লোহার জগে জল
ঢালার ঢক ঢক শব্দ ছাড়াই শুনতে পায়। ছেলেটা মাঝে মাঝে দম নিয়ে
আকুল আগ্রহে বড় বড় ঢোকে জল পান করে তাও সে শোনে।
আবার সব চূপচাপ, সার্ভেয়ারের গলা থেকে একটানা ঘর ঘর আওয়াজ
বেরোয় এবং বাতাস ভরা ছোট ছোট সীম এখিনের মত ছেলেমেয়েগুলোর
দম ঘন ঘন এবং জোরে জোরে পড়তে থাকে। বড়ো মেয়েটা ভেগে
গিয়ে বিছানার ওপর ওঠে বসে। কিছু বলতে চেষ্টা পায় সে কিন্তু তার
চোটে শব্দ উচ্চারণ হয় না। তার দাঁতগুলো তয়তর রকম কড়মড়
করতে থাকে, “ঠা-ঠাণ্ডা” শেষ পর্যন্ত সে বলতে সমর্থ হয়। দীর্ঘ
নিঃশ্বাসের সাথে দু’একটা মিষ্টি কথা ফিস ফিস করে বলে মেরিয়া, একটু
কোট দিয়ে ওর চারিপাশ ঢেকে দেয়। তবুও ছাড়াই অনেকক্ষণ ধরে অন্ধ-
কারের মধ্যে ওর ঠক ঠক শব্দ শুনতে পায়। বুখাই সে ঘুমোবার অন্ত তার
পরিচিত পদ্ম প্রয়োগ করে। একশো এবং তার বেশী গোণে সে, কবিতা-
গুলো আবৃত্তি করে, একটা উজ্জল বিন্দু বা বিন্দুক সমুদ্রের কল্পনা আঁকতে
চেষ্টা করে, কিন্তু সব বুখা। তার চারিপাশের রুম-পীড়িত বুকগুলোর
গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ, আর নিবিড় জমাট অন্ধকারে অন্তত রক্তপিপাসা
অশরীরী রহস্যজনক অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে সে।

বিছানার পাশের শিশুটি কান্না জুড়ে দেয়। মা দোলনাটা ধরে
ঘুমের সাথে লড়াই ক’রতে ক’রতে ওর দড়ির কাঁচ কাঁচ শব্দের ডালে-
তালে করুণ ঘুমশাডানি গান আরম্ভ করে—

“হায়, হায়, হায়, হায়!

ভালো লোক সব ঘুমছে,

পশুরাও ..

সেই অন্ধকারে অর্ধেকচারিত বিষণ্ণ-করণ তন্ময় গানের শব্দ অস্পষ্ট স্বপ্ন কালের রুদ্ধ উদাস সুরের মতই শোনা যায়। ঠিক ঐ ভাবেই গুহাবাসী মানুষ মনুষ্যজীবনের উদয় লগ্নে ইতিহাসের সীমার বাইরে একদিন ঝল-পেয়েছিলো। রাতের বিভীষিকা আর নিজদের অসহায় অবস্থায় মুহমান হ'য়েই তারা সাগর পারে তাদের গুহার আগুনের চার পাশে বসেছিলে—বিফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলো ওরা ঐ রহস্যভরা আগুনের শিখার দিকে—ক্ষীণ হাঁটুর ওপর হাত দুটো পেঁচিয়ে বিষণ্ণ ককণ গানের সুরের সাথে সাথে হুলেছিলো।

তার মাথাব ওপরকার জানালায় একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা ছাত্রটি চমকে ওঠে। টেপান্ মেঝে থেকে ওঠে দাঁড়ায়। আনেক্ষণ ধরে যেন তার ঘুমটা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়েছে। সে একই জায়গায় খাড়া হ'য়ে থাকে। তার ঠোট নাড়তে নাড়তে বুক আর মাথা আঁচড়ার্তে থাকে। তার পর নিজকে ঠিক ক'রে নিয়ে সে জানালার কাছে যায়। এবং কঁচের ওপক মুখটা চেপে চ্যাপটা করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'কে ওখানে?'

জানালার ওপাশ থেকে একটা চাপা শব্দ আসে।

"কিসলিনস্কি নার্কি?" অদৃশ্য লোকটাকে টেপান্ প্রশ্ন করে। "হাঁ, আমি শুনেছি পাচ্ছি। আচ্ছা বেশ তুমি যেতে পারো। ঠিকর তোমার সহায় হ'ন। আমি এম্মনি আসছি।"

'ব্যাপার কি টেপান্?' উদ্ভিন্নভাবে ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করে।

মাচ' খুঁজতে গিয়ে টেপান্ হৌচট খায়।

"হায়, হায়... আমাকে যেতেই হবে। আগি যাবোই"... দুঃখিত-ভাবে সে বলে। "কিছুই করা যাবে না, কিসলিনস্কির বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং ফরেষ্টার সব পাহারাদারদের তাকবার হুকুম দিয়েছেন।... এজেন্ট সবে মাত্র এখানে এসেছেন।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাই তুলে এবং

‘কাজের সব ক’ছর-টোপান আলে। জেলে পোষাক পরে। সে দরদালানে
গিয়ে গৌছালে-ঘেরিয়া নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে যায়—তার পেছনে
দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে। দুর্গন্ধ বিবাক্ত নিঃশ্বাসের মত একটা হাওয়া
গরম ঘরটাতে ছুটে আসে।

“একটা লঠন নিয়ে যাও সাথে”, দরজার পেছন থেকে ঘেরিয়াকে
বলতে শোনা যায়।

“দরকাব কি? লঠন নিয়েও তো পথ হারায়।” শাস্ত ফাঁকা-‘দরে
টোপান উত্তর করে। মনে হচ্ছিলো, স্ববটা মেঝেব নীচ থেকে আসছে।
দরজার চোকাঠের ওপব চিবুকা রেখে সাড়ুকত্ জানালার দিকে চেয়ে
থাকে। বাইরে অন্ধকার রাত আর ধূসর কুহেলি। জানলাব ফাটল দিয়ে
তাত্র ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসে। জানালাব নীচে টোপানের দ্রুত পদক্ষেপ
শোনা যায়। কিন্তু লোকটাকে আর দেখা যায় না—কুয়াসা আর বাজির
বুকে সে অদৃশ্য হ’য়ে গেছে। কোন রকম প্রশ্ন না তুলে, কোন অভিযোগ
না ক’বে, জব গা নিয়ে বাতাব শেষে ওঠে সে ভিজ়ে কুয়াসার ভেতর-দিয়ে
সেই ভয়ঙ্কর রহস্যময় নিস্তরুতাব মধ্যে চলে গেলো। ছাত্রটির কাছে গুর
কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিলো। গত সন্ধ্যার সেই পথটার কথা সে
মনে করে—বাঁধের দু’পাশে সাদা কুয়াসাব পর্দা, পায়েল তলে নরম
চট্টটে কাদা, বকের একটানা ক্ষীণ শব্দ—ছোট ছেলের মত একটা
আতঙ্কের ভাব ওকে আচ্ছন্ন ক’বে। রাতে ওই বাবাটি গহন অতলম্পর্শী
জগায় কি অদ্ভুত অবিখ্যাস্য সব প্রাণী-জীবন্ত হয়ে ওঠে! ওইলো গাছের
ডাল-পালার ভেতর কি ভীষণ সাপের মত সব জিনিস পেঁচিয়ে ঝুঁচিয়ে
বসেছে। আর একা, শাস্ত ভাবে, ভাগ্যের পায়ে মাথা নীচু করে, অন্তরে
একটুখানিও ভয়ের চিহ্ন না নিয়ে টোপান এখন সেই জলাকুমি ওপক-দিয়ে
ঠাণ্ডায় ভিজ়ের মধ্যে কাপতে কাপতে পথ চলছে—অর গায়ে—সেই অর,
যে অর তার ভিন ছেলেমেয়েকে, কবরে পাঠিয়েছে এবং সম্ভবত অস্ত

গুলোকেও পাঠাবে। সজার-বাড়ীওয়ালা এবং সিন্ধু ক্লাস্ত দৃষ্টি সন্মার এই সরল লোকটা সার্জিকতের কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্য বিশেষ।

পাতলা একটা ঘুম আসে ওর! রান ছারাময় আকৃতি এবং মুখগুলো ওর সামনে ঘাওয়া আসা করে। “এটা শুধু স্বপ্ন। এগুলো শুধু প্রেতাত্মা,” সে নিজেকে নিজেই বলে—যদিও সে জানে যে সে ঘুমিয়ে। কল্প, অল্পট কল্পনায সে দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে যায়—অলস্ত সূর্যের নীচে পাইনবনের গছের মধ্যে সার্ভে করা...সঙ্কীর্ণ পথটা, বাঁধের দু'ধারে কুয়াসা, টেশাপের কুটির . টেশাপ নিজে, তার স্ত্রী এবং তার ছেলে মেয়ে। সার্জিকত স্বপ্নও দেখে—অন্তরে দুঃখ নিয়ে সে আবেগতরে সার্ভেয়ারকে বলছে : “এ জীবনের লক্ষ্য কি ?” —উক অক্ষ তার চোখে জমে ওঠে। “এই কল্পন আগাছার দল মাস্তবের কোন কাজে লাগে ? এই হতভাগ্য নিরীহ ছেলেমেয়ের রোগ এবং মৃত্যুর কি অর্থ হতে পারে—যাদের রক্ত এই রক্তশোষক জলাভূমি শুষে নিচ্ছে ? ওদের দুঃখকষ্টের কি ঘৃণ্তা ওদের ভাগ্য দিতে পারে ?” কিন্তু সার্ভেয়ার ক্রোধে ললাট কুঞ্চিত করে মুখ কিরিয়ে নেয়। অনেক দিন থেকেই সে এই দার্শনিক চিন্তার ক্লাস্ত হয়ে পড়েছে।...টেশাপ পাশে দাঁড়িয়ে, মুখে তার সিন্ধু নদ্র হাসি। ধীরে ধীরে সে তার মাথা নাড়ে উচ্চত সুবকদের উপর করুণা দেখাবার জন্যে বোধ হয়—যারা বোকে না যে মাস্তবের জীবন হীনতার নিঃস্ব আয় ওর ঠিক বিপরীতও ; আর এটাও তেমন চিন্তার বিষয় নয় কোথায় সে মলো—বুদ্ধ-ক্ষেত্রে, বিদেশে, নিজের ঘরের বিছানায় অথবা জলঃশয়ের করে।

যখন সে জেগে ওঠে তখন সার্জিকতের মনে হয় যে সে আকৌ ঘুমাযনি—একান্ত ভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে এসব কথা চিন্তা করেছে শুধু। বাইরে ভোর হয়ে আসছিলো। কুয়াসা তখনো পুক এবং তারী হয়ে বুলছে রাতের মত, কিন্তু ওটা ধূসর থেকে ভূষারধবল হয়ে গেছে এবং তারী একটা পর্দা ওঠার মূণে যেমন কাঁপে স্থানে স্থানে তেমনই কাঁপছে।

দুর্ধর্ষকে দেখবার জন্তে এবং গ্রীষ্মের প্রভাতের টাটকা নিম্নলব্ধ বাতাস সেবন করবার হ্রস্ব এবং দূর্বীর আকাশজ্ঞা সার্ভূকতকে পেয়ে বসে। তাড়াতাড়ি শোবাক পরে নিয়ে ও বেরিয়ে যায়। তিনে কুয়াসাঝ পাত্ একটা চেউ ওর মুখে এসে লেগে ওকে কাঁপিয়ে তোলে। পথ ঠিক করবার জন্য সার্ভূকত বাধের ওপর দিয়ে জোরে দৌড়াতে থাকে এবং উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করে। কুয়াসা মুখের উপর বসে তার গৌক এবং চোখের তারায় জড়িয়ে যায়। সে ঠোঁটের ওপর ওটাকে অহতক করে, কিন্তু প্রতি পদে দম নিতে ক'ম কষ্ট হয়। অবশেষে, যেন পতীর স্যাঁতসেতে একটা অন্তলম্পর্কী ষাদের ভেতর থেকে সে একটা বালুময় পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ওঠে। পায়ের নীচে গীমাহীন চিকিমিকি শব্দ। প্রান্তর জুড়ে কুয়াসা ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু মাথার উপর নীল আকাশ। স্মৃষ্টি সর্ব্ব পাছের ডালগুলো ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে এবং দূর্ধর্ষক সোনালী রশ্মি বিজয়ের নেপাথ্য উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

মানিক জোড়

রোমানফ

ছত্রিশ বছর বয়সে, গুরুত্বর পলিপ্রাইমের ফলে, তাকে টিউবারকুলোসিসে
থরেন। পাঠানো হয় তাকে ক্রিমিয়ায়। সাগরের ধারের একজন বৃদ্ধির
কাছ থেকে সে একখানা ঘর নেয়। কোন কাজ না ক'রতে সাবধান
করা সন্তোষে সবসময়ই একখানা নোটবুক আর একটা পেন্সিল জাখে নিয়ে
বসে।

স্বাস্থ্যনিবাসে খাম্বার সুবিধে থাকলেও সে যাবে না। গোলমাল
এবং বেশি লোকজন সে পছন্দ করে না। লোকজনের সঙ্গ থেকে ব্যাকুল
ক'রে তোলে, অথবা এগু ধরা চলে যে, ওদের সাথে মেলামেশা করার
অক্ষমতাটাই এর জন্ত দায়ী। যশ অথবা ক্ষুণ্ণ মর্যাদা থেকে একটুও
বদলাতে পারে নি। জনতার মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করে। সর্বদা তার
মনে হয় যে আনন্দ এবং রসিকতা তার কাছে কেউ দাবী ক'বছে ; অথচ
সারাজীবন ধ'রেও সে কোনদিন কোতুক অথবা রসিকতাপূর্ণ কোন কথা
বলে নি।

প্রথম আলাপে যে সমস্ত মেয়ে তার দিকে সজীব এবং উৎসুক কটাক্ষ
হেনেছে, তারা আস্তে আস্তে আগ্রহশূন্য হ'য়ে গিয়ে নীরব ঔদাস্যে ওর
কাছ থেকে স'রে গেছে। আর কিরে তাকায় নি তারা। কথার ঐশ্বর্য
তার নেই এবং সে বুঝতো যে এই শক্তি ছাড়া, রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা
বলার অক্ষমতা থাকলে, মেয়েদের কাছে ঘেঁষা যায় না।

অসংখ্য মেয়ে যারা এই সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাসে অথবা স্বাস্থ্যকর স্থানে
আসে, তাদের মধ্যে অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মেয়েরাও পুরুষের সাথে
কোতুকজনক এবং সজীব কথাবার্তায় মেতে থাকতে চায়।

সে প্রায়ই কিরকির সাথে লক্ষ্য ক'রেছে, কেমন ক'রে সম্পূর্ণ সাধারণ নীচ স্বভাবের ফেলোশুলাও হৃন্দরী মেয়েদের কাছে অত্যন্ত হ্রাসপাত হ'য়ে উঠেছে—ওখু তাদেদর এই বকবকানি এবং প্রত্যেকটি কথাই হাসাবার কথ্যতা ধারা।

সে প্রায়ই নিম্নে ক'রেছে এটা কি সম্ভব যে, যে সমস্ত মেয়ে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে, তৃপ্তি জাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী চটুল এবং হৃন্দর, তারা এতই মুগ্ধ যে ওরা ওখু আমোদ আর তামাসা ভালোবাসে।

প্রথমটা ওদের মধ্যে অনেকে এমন উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতো ওর দিকে অর্থাৎ ওই ভাস্বর শিল্পী এবং ওই সুন্দরদৃষ্টিসম্পন্ন কবির দিকে। শেষে একদিনেই ওদের উৎসুক্য জুড়িয়ে গিয়ে ওরা পূর্ণ ঔদাস্তে ওকে ছেড়ে যায়। যদি সে হৃন্দব হ'তো, যদি তার কপালের উপর ছড়িয়ে পড়া কৌকড়ানো চুল থাকতো এবং তীক্ষ্ণ, নিখুঁত, একটু ফ্যাকাসে এবং প্রতিভা-উজ্জ্বল একগুণা মুখ থাকতো, তা'হলে এরা একটু মনোবোগ দিয়েই ওকে দেখতো, এবং ওর ক্ষুতিযুক্ত চমৎকার কথাবার্তার অক্ষমতাকে আংশিক ক্ষমা করতে পারতো।

কিন্তু তার বাইরের চেহারাটা নেহাৎ সাধারণ। পাড়র এবং লাজুক মুগের ওপব ছোট পাতলা একটুখানি দাড়ি, রোগপাতুর নগণ্য নিরীহ গোছেব চলাফেরা। কাপড় চোপড় কি ক'রে গুছিয়ে প'রে যেতে হয়, সে জানতো না। আজকাল সে ধূসর রংএর একটা কোট পড়েছে—তাতে সাদানিধে একটা টাই। সে ঠিক ক'রতে পারেনি, কোটের বোতাম আদাগাই রাখবে কিংবা বন্ধ ক'রে রাখবে। এক সময় তার মনে হয়, বোতাম ঝুঁটে বেরোনটা ঠিক নয়, আবার এর উলটো ভাবে, অর্থাৎ বোতাম খুলে রাখলে কোটটার অনেকটা দেখা যায়।

রোজ সকালে সন্ধ্যের ধারে গিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে দেখে—

সমুদ্রের উজ্জল বিস্তৃতি, যেখানে দিগন্তরেখা স্পষ্টভাবে আকাশের কোলে মিলিয়ে গেছে সেখানে, অথবা সমুদ্র পারের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে যেদিকে মেয়েরা হেঁটে বেড়াচ্ছে সেদিকে। ওদের পরণে খুব পাতলা পোষাক— দক্ষিণের স্বর্ষের দিকে ওরা ওদের হাত পা ছাড় এবং কাঁধ উন্মুক্ত করে রেখেছিলো।

ওরা ওর দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কোন মেয়ে, যে উজ্জ্বলিত মুহূর্ত এবং হৃদয়গ্রাহী লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তার কাছে ওর সন্ন্যাসী পরিচয়টাই বেশী—ওইরকম কোন পরিচয়ের চেয়ে।

এই ধরনের মেয়েদের ভাবায়, একজন বিশ্বাস্যকর ব্যক্তিত্ব ব'লে বোঝায় ঝুপুট মাংসপেশীযুক্ত একজন মানুষ, যে ওদের দিকে স্থির-দৃষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবং যে প্রাণস্পর্শী এবং উজ্জ্বলসূর্য কথাবার্তা আদান করে দিতে পারবে, সেই।

কি চুপের ব্যাপার যে, প্রকৃতি তার শ্রেণী নির্বাচনে মানুষের তেতরকার আদিম প্রবৃত্তিগুলোর ওপর এত বেশী জোর দেয়, আর আধ্যাত্মিক সম্পদ এবং নৃষ্টি প্রতিভাকে অবহেলা করে।

প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখতো যে হঠাৎ একদিন অসুস্থতাবে একজন মেয়ের সাথে তার দেখা হ'য়ে যায়, সে বলিষ্ঠ মাংসপেশী অথবা সঙ্গীর্ণ এবং বাহ্যিক চাক্চিকাময় কথোপকথনের দক্ষতার দিকে চাইছে না।

এই চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। সমুদ্রের ধারে গিয়ে একবারে অনেকক্ষণ ধরে ব'সে থেকে সে কল্পনা ক'রতো কেমন ক'রে তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই আকস্মিক ঘটনা ঘটবে। যেন একদিন সমুদ্রের তীরে তার সাথে দেখা হ'য়ে যাবে, এবং তার পরিচয় পেয়ে সে ওর ওপর আসক্ত হ'য়ে পড়বে। তার নৃজনী শক্তিই ওর কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হ'বে। তার চেহারা যে খারাপ, অথবা সে যে দক্ষ, কোণালী অথবা বাহাদুর নয় এ সবের ওপর ও দৃকপাতও ক'রবে না। তা'হলে চিত্তস্তব্ধ

নিঃসঙ্গতার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে নিঃসঙ্গতা তার ত্যাগের সাথে জড়িত হয়ে আছে।

মেয়েদের চিরকালই সে স্বপ্নের এবং মহিমাবিত ব'লে মনে ক'রে এসেছে। পাছে সে তাদের কোন সামান্য নিবোধ এবং কল্প উক্তির দ্বারা অপমানিত ক'রে বসে, এই তার ভয় ছিলো। অথচ স্পষ্টত এই সমস্ত উক্তিই মেয়েরা চায়।

আলাপ শুরু হ'বার পথে তাদের শিষ্ট অথবা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মনোভাব সম্পন্ন মনে হ'লেও, এ ধারণা স্থায়ী হয় না। নিজের চোখে সে দেখেছে কি ক'রে সেই সমস্ত মেয়েকে হালকা আমোদে মাতানো যায়; কেউ তাদের হাসাক', নিছক এটাই যেন তাদের কাছে ক্রীতিকর।

তাদের আধ্যাত্মিকতায় তুলে যদি কেউ ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে মেশে, তবে মাস খানেকের তেতরই হয়তো তার মুখের ওপর, যে আট এবং সৌন্দর্যের পেছনে আর্টিষ্টরা ছুটে বেড়ায়, তারই বিষয়ে অত্যাধিক আলোচনার ফল স্বরূপ ক্লাস্তি ও অবসাদের একটা রেখা ফুটে উঠতে দেখতে পারে।

যে অচকল অধ্যবসায়ের দ্বারা আর্টিষ্ট তার লক্ষ্যের মুখে এগিয়ে চলে, সেটা তাদের কল্পনার বাইরে। উচ্চ মূল্যের জন্য সে শীগিরই ক্লাস্ত হ'য়ে উঠে, সম্ভবত দ্বারা ওর সাথে অচ্ছেদ্য সংস্পর্শ রেখে চ'লেছে, অথবা তাদের জীবিকাই ওই, তারাই শুধু ওই আট এবং সৌন্দর্যের মূল্যের সর্বাঙ্গ দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কি অস্বাচ্ছন্দ্যকর এবং দুঃখদায়ক মনে হয় যখন কোন লোকের কাছে কেউ তার প্রাণের সমস্ত কথা উজ্জ্বল করে দিয়ে দেখতে যায়, সেটার একঘেয়েমির জন্য সেই লোকটার মুখের ওপর ক্লাস্তি ও অবসাদ ফুটে উঠেছে—বীশক্তি সম্পন্ন লোকের কাছে যে একঘেয়েমির অর্থই অসীম ধৈর্য।...তা হ'লে কি চিরন্তন নিজ'নতাই তার পাণ্ডা ?

হয়তো তাই

সেদিন সকালে শিওন আর্টিষ্টের নামে একখানা চিঠি দিখে যায়, খামের ওপরে চমৎকার নরম হাতের লেখা। মেয়েলি লেখা—দেখলেই বোঝা যায়। মৃত্যু অস্পষ্ট একটা গন্ধ—গন্ধওয়ালা কোন বাত্মে কাগজ থাকলে যেমনি গন্ধ পাওয়া যায় তেমনই।

বিস্মিত এবং উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ও। লুক দৃষ্টিতে সে সূক্ষ্ম সরল লাইনগুলো পরীক্ষা ক'রতে থাকে—লাইনগুলো শেষেব দিকে বাঁকা, যেখানে একটা ক'বে শব্দ বসানো হ'য়েছে, না হ'লে অন্য লাইনে সেটাকে ঢোকাত্তে হয়।

“তুমি হয়তো চিঠিটা পেয়ে বিস্মিতই হবে—যাকে চেনো না সেই রকম একজন মেয়ের কাছ থেকে চিঠি, এবং যে তোমাব মাদ্রিত এবং কোমল স্বন্দব হৃদয়কে ভালবাসে। বুঝি না কি কবে এটা হ'লো! কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে তোমাকে দেগেই আমি তোমাব পরিচয় পেয়েছিলাম। তোমাকে সিখবার জন্য আঁমাব অদম্য ইচ্ছা হ'চ্ছিলো।

“তোমাকে আমি লক্ষ্য না ক'রে পারি নি। বুঝেছিলাম যে তুমিও আঁমাব মতই একা। কিন্তু এ থেকেই কোন সিদ্ধান্ত ক'বে বোঙ্গোনা যেন—কোন নীচ'লোক এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত ক'রে সাধাবণত।

“আমাদের পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়া যে আমার একটুও ইচ্ছা নয়, এ ক্ষেত্রে যা সাধাবণত হয়ে থাকে, এটা প্রমাণ করবার জন্য আমি একটা অপরিস্রাব সত' আরোপ করতে চাই, সেটা এই যে অর্ধিস লিখতে থাকলেও তুমি আঁমাকে দেখবার জন্য কোন রকম চেষ্টা ক'রবে না। এইটাই তুমি নিসংশেহ হ'তে পারবে যে আমার স্বর্কবুলক কোন হতলব নেই কিছুমাত্র।

তোমাকে পঞ্চাঙ্গের উপর বসে লাগরের দিকে, তারিফে থাকতে দেখে আমার মনে হ'য়েছিলো যে আমাদের অন্তরের মিল আছে। আমারও ওই মস্তিস্কহীন নির্বোধ জনতার উপর ঘৃণা আছে—যারা জীবনে মূল্যবান কিছু গ্রহণ ক'রতে অনিচ্ছুক এবং যারা কখনও সামাজিক সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারে না। ওটা এদের বিরাট শূণ্যতা থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র। এখানে হয়তো তুমি আর আমি শুধু সেই রকম প্রাণী—যারা নিজেদের অন্তরের দীপ্তিতে বেচে থাকতে পারে এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জীবনকে উপভোগ ক'রতে পারে। আমাদের বোধশক্তি এত মজিত যে, আমরা সূচক জগতের সাহায্য ছাড়াই খুব সূক্ষ্ম এবং পরম আনন্দ উপভোগ ক'রতে পারি। আমি সেই সমস্ত লোককে খুবই চিনতে পারি, যাদের অন্তরে এই শক্তি আছে এবং বিজ্ঞনতাকে উপভোগ ক'রবার সামর্থ্য আছে। ওই সমস্ত ছলিত লোকই আমাকে মুগ্ধ করে। কিন্তু, দূর থেকেই তাদের বিষয়-চিন্তা ক'রতে আমার ভাল লাগে। জীবনে সর্বপ্রথম সেইরকম একজন লোককে আমি চিঠি লিখছি, সে হচ্ছে তুমি। অন্তরের সম্পদ ধার বত প্রচুর আমার কাছে সে তত নোহর এবং প্রিয় এবং ততই আমি তার থেকে দূরে থাকতে চাই, যাতে জড়জগৎ আমাদের অন্তরের মিলনের ওপর কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। যৌন আকাংক্ষা আধ্যাত্মিক চাহিদার বিরোধী। এবং গোড়া থেকেই প্রথম দৃষ্টিতেই সেটা লক্ষ্য ক'রতে পারে। মেয়ে-পুরুষ, আধ্যাত্মিক দীপ্তি বাদের প্রাণসম্পদ, তাদের জীবনের ওটাই হয় শোচনীয় ব্যর্থতা।

“তাহলে আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হ'ক। আমি তোমাকে চিঠি লিখতে থাকবো, কিন্তু তুমি আমাদের সবকটাকে আধ্যাত্মিক থেকে দৈহিক ভিত্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবে না। আমাকে দেখতেও চেষ্টা করবে না অরুচি। মানবজাতির উপরে আশা আমার নেই, বতই আধ্যাত্মিক

সম্পদ ভার থাকুক না কেন। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দৈহিক দিকটা জরী হ'য়ে উঠবে না। শুভে হয়তো জীবনের সবচেয়ে অপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

“মূল ভগতের শক্তিটা যখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসবে, তখনই শুধু আমরা দেখা ক'রতে পারব।”

৩

চিঠিটা আর্টিষ্টকে অবাক ক'রে তুললো। সে একটা উত্তর দিনে—
ঠিকানার আয়গায় “তলব না পাওয়া পর্যন্ত ভাকঘরে পড়ে থাকবে” এই রকম লেখা, আর সংক্ষেপে এ, আর, বসানো তার পাশে। বিজ্ঞানে ব'সে সে যে রকম মেয়ের কথা ভেবেছে এ ঠিক সেই রকম। নিজের কাছে জীবনের সবচেয়ে বেশী যেটা মূল্যবান ব'লে মনে ক'রেছে, মেয়েটা ঠিক তাকেই মর্যাদা দিয়েছে। প্রতিটি কথায় ওর প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে, যেন ওরা দুজনে যদজ আত্মা—যেন পরস্পরকে বহুদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই মেয়েটার সাথেই একসঙ্গে অন্তরের কথা উচ্চকণ্ঠে ভাবা চলে। তার মহান্ চিন্তা সে বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করবে না, আর এই অথও নিরালা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে দিতে পারে সে-ই।

সে তার চমৎকার, ঝরঝরে হাতের লেখার দিকে চেয়ে থাকে, আবার কাগজে মাথানো মুদ্রগন্ধ শোঁকে, আর তার মনে হয়, যেন তার স্নান হনয়ের গন্ধও সে অনুভব ক'রছে।

কেন সে ভাবে, যে মেয়েলি মাধুর্য এবং সৌন্দর্য শুকে অভিবৃত্ত ক'রে ওই রকম অপূৰ্ণ এবং অদ্ভুত মিলন নষ্ট ক'রবে? না, না, সে এমন কোন ভাব দেখাবে না, যাতে ওর এই অকপটতার জন্য মনে কোন আঘাত লাগতে পারে।

যদি সে ওর সাথে হাত ধরাধরি করে ওই সমস্ত আকাট মূৰ্খ উৎসব-

মুখর এবং নির্লক্ষ মেয়ে, ঘান্না নিজেদের অজ্ঞেয় বলে মনে করে থাকে, তাদের মধ্যে বেড়াতে পারে—তবে তাই যথেষ্ট হ'তো। কি ঈর্ষাই না ওদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারতো। শুধু সে-ই সবসময়টা একসাথে গুর কাছে থাকবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা এমনমব কথাবার্তা ব'লবে যা তারা বুঝতেই পারবে না। অথবা বেলাভূমির ওপর নিস্তব্ধভাবে ব'সে ওদের সৃষ্টি প্রসারিত করে রাখবে—ওই দূর দিগন্তে কুয়াশা-ঘন সন্ধ্যায় যা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

একটা উপকথা হয়তো ওদের কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে, আর বুঝতে না পেরে হয়তো অনেকে অবাক হয়ে যাবে, যে ওই শান্ত-মৌন লোকটি কি করে গুরুত্ব একটা মেয়েকে আকৃষ্ট করলে।

যেখানেই সে যায়, সেখানেই ওকে খোঁজে। একটা যেন মোহ জন্মে গেলো তার। উৎসুকভাবে পরের চিঠিটার আশায় থাকে। পার্কে প্রত্যেকটি তরুণীর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে—কে সে !

প্রথম চিঠিটার যেটুকু ব্যবধান ছিলো, পরের চিঠিগুলোতে তা ঘুচে যায়। প্রতিটি নতুন লাইনের মধ্যে মেয়েটির অন্তরের পরিচয় আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। বয়সে স্পষ্টই সে তরুণী এবং দৈহিক প্রেম সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। জড় ভগ্নতের সংস্পর্শে আসতে তার আশঙ্কা।

একখানা চিঠিতে তার লেখা ছিলো :

“বন্ধু। তোমাকে বন্ধু বলছি, কারণ যে নীরস মল্লভূকে আমরা পৃথিবী বলি, সেখানে আমার একমাত্র বন্ধুই তুমি। গতকাল পাহাড়ের ওপরে পাইন গাছের তলায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, সেদিন কি আনন্দেরই না হবে, যেদিন তোমার আত্মজরী হবার পর আমরা একসাথে শান্তভাবে ঘুরে বেড়াবো, এবং যে সমস্ত ধারণা আমরা আজ শুধু লিখেই জানাতে পারি, সেদিন পরস্পর আলোচনা

করতে পারব। যে দুঃখ আমাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, কোন দিন কি সে দুঃখকে তোমার কাছে প্রাণ খুলে বলতে পারবো, এবং তোমার মত বন্ধুর কাঁধের ওপর তবু দিয়ে দাঁড়াতে পারবো ? উঃ, বন্ধু, কি সমাস্তিক সে চিন্তা ! তুমি হয়তো কোন কথাই কইকে না, শুধু শাস্ত্র সংযত স্নেহে আমার দীর্ঘ ঘন চুলের ভেতর হাত বুলাতে থাকবে।

“কখনও কখনও তোমাকে দেখি.....তুমি চিন্তিত এবং উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চলেছো, লোকের মুখের দিকে সঙ্কানী দৃষ্টিতে চাইছো। তোমার প্রতিভা সর্বদা সক্রিয়। কি দুঃখ যে আমি পাঠি, স্বপ্ন ভাবি যে তুমি ওই সমস্ত মোটা এবং আত্মসন্তুষ্ট জীবনের মাঝে ঘুরছো। প্রকৃতিকে ওরকম প্রতিভা সৃষ্টিব জন্ত ধন্যবাদ না দিয়ে ওবা তোমাকে উপেক্ষা করে।”

৪

একদিন সন্ধ্যায় মুক্তোর মত বলহলে সমুদ্রের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আর্টিষ্ট একজন জীলোককে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখলেন। সে একা। লম্বা এবং ক্লান্ত তার গড়ন। তার সাদা স্কার্ফের প্রান্তভাগ প্রায় মাটিতে ছুঁয়ে পাতলা রেশমী জালার মত মুহূর্ত হাওয়ায় উড়ছিলো।

অপ্পই আভালে তাব বুক তরতর ধুক্ ধুক্ করছিলো। ও ভাবতে না দেখতে পায় এমনভাবে লুক্ক দৃষ্টিতে সে ওকে দেখে, যদিও বুঝছিলো সে যে ওটা তার করা উচিত নয়, কারণ তার মত তবু হচ্ছিলো।

পাহাড়ের চূড়ায় যে থেমে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে নিম্নতর তাকে সে দাঁড়িয়ে রইলেন। নীল কুয়াশা-স্তিমিত দূর তীরে—যেখানে ইয়ালটার মিটমিটে আলো জলছিলো—সেদিকে তার দৃষ্টি বিসর্জিত।

তার মুখখানা স্থির, দৃষ্টি দূরবিলম্বী ; অলিত ‘স্কার্ফ’ জড়ানো ওকে দেখে একটা অশরূপ অশরীরী-আত্মা ব’লে মনে হয়। আর্টিষ্ট মুক্

বিশ্বয়ে গেমিক ডেরে রইলো। অপ্রত্যাশিত অপরূপ স্বর শুনে কোন চোখের কোনে জল জমে ওঠে, তেমনি আটাইও বুঝিলো। তার চোখও জল জমে আসছে।

চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো যে, “আমি এখানে! আমি পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হবো না। আমাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রেখো না। আমি তোমার লজই শুধু চাই। আর কিছু নয়।”

ধীরে ধীরে সে পথ বেয়ে নামতে থাকে। ওর পাশ দিয়েই তাকে যেতে হবে। প্রায় কীপতে কীপতে সে খোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে ওর চলে যাবার প্রতীক্ষায় থাকে। মাথা নীচু করে যাবার সময় পশপ থেকে ওকে দেখে। মুহূর্তের জন্য ওর চোখ দুটো সে দেখতে পায়— অদম্য যন্ত্রণাভরা চোখ দুটো। কোথায় সে যায় সেটা সে দেখতে পেতো ক’রনে—কিন্তু পার্কে ভীড়ের মধ্যে ও হারিয়ে যায়।

সে-রাজে একটুও বুঝতে পারে না সে।

ওর চিঠিগুলো আরও উৎসাহপূর্ণ হ’তে থাকে। ওরা এখন ছ’জনেই ছুজনে লেখে—প্রেমবিশ্বাস ছুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, বহুদিনের লজের স্নেহের বন্ধনে মিশিত মানবাত্মা হিসেবে।

একখানা চিঠি সে নিজেকে লিখেছিলো মেয়েটির কাছে :

“বন্ধু, সারারাত ধরে তোমার কথা এবং আমাদের প্রেমের কথা ভেবেছি। আমার ভাবকে তার সৌভাগ্যের জন্য ধন্যবাদ দিই। আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো ; কারণ, আমাদের আত্মা গহীন গহ্বর থেকে ঐশ্বর্য বের করেছে—যা’ সমস্ত কামনা বাসনার উৎস। গতকাল জানলার ধারে ‘স্নাওয়ার ড্রেনে’ এক তেলুকা কুল পেয়েছি। বুঝেছিলাম যে তুমিই সেটা গোপনে রেখে গেছো। এই অনোক্তাই মজারকি মিথ্যেতে প্রভেদ—এই স্মৃতি এবং কুলের সৌভাগ্যে,

কাদের নির্বোধ মেয়েদের মুখ করবার ক্ষমতা আছে, তাদের দেখে যে ঈর্ষান্বিত ভাব আমার মনের মধ্যে জেগে উঠতো—সেটা এমনি মিলন ঘটাতো অক্ষম। যখন তোমার লম্বা, স্বন্দর এবং গভীর চিন্তাকূল বিমর্ষ মুখখানার কথা কল্পনা করি, তখন আশ্চর্য হ'য়ে নিজেকেই নিজেকে ঝগড়া করি, 'অতটা মুখ আমি কেমন করে পেতে পারি' ?

সে 'ইচ্ছে ক'রেই চেহারার বর্ণনা দেয়—কল্পনার চমকে ওকে বিস্মিত করতে চেয়ে ছিলো ও।

“কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে ছাড়ার মত বেঁচে থাকার সার্থকতা কি ! তুমি আমাকে এখন বিশ্বাস ক'রতে পার যে, আমার দৈহিক আকাজকাটা প্রবল হ'য়ে সমস্ত নষ্ট ক'রবে না, আমাদের মিলনের গ্রন্থিও ছিঁড়তে পারবে না—যে মিলন আমার মনের পক্ষেই প্রয়োজন, শরীরের পক্ষে নয়। আমি তোমার সাথে বেড়িয়ে বেড়াতে চাই বন্ধু, সর্বদা তোমার পাশে পাশে থাকতে চাই। এত দেরীতে তোমার চিঠি আসছে ! ওর জন্তু অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।”

প্রত্যুত্তরে সে একখানা চিঠি পাঠায়—খানিকটা আশঙ্কার ছাপ তাতে। লিখেছে, সে সব বিষয়েই রাজী, কিন্তু তার সাথে দেখা করার জন্তু যেন সে তাড়াতাড়ি না করে। জীবনের একমাত্র আনন্দ থেকে যেন সে বঞ্চিত না করে—যদিও তা'তে একটা ছায়া নিয়েই সুখী থাকতে হবে, কিন্তু আগে তো কোন ছায়াও তার জীবনে ছিলো না।”

সে আরও লিখেছে, “বন্ধু জান না, আমার কষ্ট কি। তুমি বোঝনা যে, তুমি আমাকে এমন জিনিস দিয়েছো, যা কোন দিন পাই নি”। আমার কি ভয় নেই, যে কুটিল অগৎ আমাকে এমন দুঃখের মধ্যে এনে ফেলেছে, আমার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র আনন্দকে সে নিঃশেষে মুছে নিয়ে যাবে।

“তুমি লিখেছো যে তুমি আমার পাশে বেড়াতে চাও—ওতে আমার

জর হ'চ্ছেও: কি আনন্দই ওতে হ'তো! কিন্তু আগে আমি তোমার ওপর আরও বিশ্বাস আনতে চাই, আমাদের হৃদয়ের নৈকট্য লব্ধে আরও বিশ্বাস জাগাতে চাই। তখনই তুমি এটা লুপ্তব।

“অভিযোগ ক'রেছো তুমি চিঠি আসতে অনেক দেরী লাগে। আজ্ঞা এরকম বন্দোবস্ত করা যাক। পাহাড়ে উঠবার পথের ওপর বেখানে পাইন গাছটা দাঁড়িয়ে, তার পাশে যে বড় পাথরটা আছে, তার নীচে তোমায় চিঠি রেখো, আমি এসে নিয়ে যাবো। অজুত মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের তয় পাবার কোন কারণ নেই।”

আটাই তার চিঠি নিয়ে পাথরটার কাছে যায়। এক এক দিন এক এক সময় যায়, তা'কে দেখতে পাবে আশায়, কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসে। একবার সে তাকে দেখেছিলো—সাদা ‘স্কাফ’ পরা লম্বা তরুণীটিকে। বেঞ্চে ব'সে সে একখানা চিঠি পড়ছিলো; মাঝে মাঝে চোখ তুলে দূর সাগরের নীল বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রছিলো। চিন্তায় এতো আচ্ছন্ন ছিলো সে যে তার পাশ কাটিয়ে গেলেও সে ফেরে নি। সে ভাকালে খেয়ে গিয়ে সব কথাই ও তা'কে ব'লতো। নিঃসন্দেহ হবার প্রয়োজন ছিলো যে ওটা তার চিঠি। যেতে যেতে কাঁধের ওপর দিয়ে ও ওর দৃষ্টিটিকে একবার বুলিয়ে নিয়েছিলো, কিন্তু হাতের লেখা তার নয়। সে যে অন্তের চিঠি প'ড়ছে, এটা ভেবে ও নিরাশা ও আহত বোধ ক'রলে। হ'তে পারে যে, সে মা অথবা কোন বান্ধবীর কাছ থেকে চিঠিটা পেয়েছে। এই চিন্তা তার আহত অভিমানে কোন সাহনাই দিতে পারলে না—

কিন্তু তার চোখে প্রবোধহীন হৃৎকের ছাপ কেন?

তিন দিন পর, একজন তরুণী পাহাড় থেকে লাফিয়ে প'ড়ে চূর্ণ হ'য়ে গেছে, এই খবরটা তাকে আচমকা বজ্রের মত আঘাত ক'রলে।

উল্লেখ্যভাবে সে ছুটলে—কোথায়,—সে জানেনা। বোধ হ'লো,

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটাকেই যেন তার কাছে থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। কেন সে তার ওপর বিশ্বাস রাখে নি? কেন যে এরকম একটা গুরুতর ব্যাপারে তাকে বিশ্বাস ক'রে সাহসনার জ্ঞান আসে নি? এত নিষ্ঠুর! এতো অমানুষিক নির্মম! হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসে। পাথরটার কাছে ছুটে গিয়ে সেটাকে তুলে একখানা চিঠি সে পায়। সে দিনের তারিখ দেওয়া ওতে...

একটা অভূতপূর্ব দুঃস্বপ্ন আনন্দ তা'কে অভিভূত ক'রে ফেলে। বৈচে আছে সে! ... তার দ্রুত সিদ্ধান্তের জ্ঞান সে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলে, কারণ, সে এখন সঠিক বুঝতে পারলে ওই তরুণী তার কাছে কত প্রিয়, কত অপবিহার্য।

কম্পিত হাতে সে ওকে একখানা চিঠি লেখে—ওতে প্রেমের তারে যে ঝঙ্কার সে তুলেছে, এমন কখনও তোলে নি। কোন কিছুই আর তাদেব সম্পর্কে বিকৃত ক'রতে পারবে না, সে বললে এবং তার কাছে আসবার জ্ঞান ওকে অনুরোধ জানালে।

উত্তরে তাবের আবেগে ও জানাল যে, যে তার অত ঘনিষ্ঠ তার বিচ্ছেদ সেও আর সহ্য ক'রতে পারছে না। এবং প্রতিজ্ঞা ক'বছে যে শীগগিরই ওকে সে দেখতে পাবে।

কিন্তু লোভ তার উদ্যম হ'য়ে ওঠলো। সে পাথরের পাশে একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে রইলো। তার জ্ঞান অপেক্ষা করার স্বপ্ন নিয়ে, যদি সারা দিনরাত অপেক্ষা ক'রতে হয় তাও।

হঠাৎ ঝোপের তিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড় দেখতে পেলো। একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে ঝলকে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে এসে সে তার হাত ধরবে বা'তে সে পালাতে না পারে। তারপর বোনের মত কপালে একটি চুয়ন এ'কে দেবে সে। তার পাতলা সুন্দর দেহলতা ওর দেহের ওপর ঝুঁকে প'ড়কে—অসীম বিশ্বাসে ওই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের

ভেতর—যেখানে সে সমস্ত হৃৎকের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো সে। ইঠাম্ সেই সময়ে, যখন সে নিজকে প্রকাশ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠবে .. আত্মকে বিহ্বল হ'য়ে সে দেখতে পেলো, পাখরের ওপর খুঁকে পড়েছে যে মেয়েটা তার গিঠে কুঁজ, হাত জুলো বান্ধরের মত লম্বা লম্বা। তার গায় লম্বা চুল এবং গভীর হৃৎকতরা ধূসর চোখ দুটো—প্রকৃতির নিষ্ঠুর অবিচার যার ওপর হয়েছে তাতেই শুধু ওরকম দেখা যায় তার পোষাকের নীচে তম্বুর কুঁজটা একটা পিরা-মিডের মত—তার প্রতিকূল ভাগ্য যেন চিরজীবনের জন্ম একটা অভিশপ্ত বোঝার মত শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো ওটা ওর জীবনের সঙ্গে।

মেয়েটা চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে—চোখে তার জল চক্চক ক'রছে—আন্তে আন্তে পথ বেয়ে নেবে যায়ও—যেন একটা অমূল্য সম্পদ সে ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে। হৃৎকে ও আত্মকে আটটি ওর অদৃষ্ট হওয়া পর্বস্ত অপেক্ষা ক'রলে, পরে উল্টো মুখে ছুঁতে আরম্ভ ক'রলে। তাকে আর সে দেখতে চায় না।

সুণা শোলোকভ

যুদ্ধের সময় ঠিক মাহুঘের মতই গাছপালাও তার চরম পরিণতি লাভ করে। একটা প্রকাণ্ড অরণ্যভূমিকে আমি আমাদের কামানের গোলায় 'মিম্বল হ'তে দেখেছি। খুবই সম্প্রতি জার্মানরা একটা অজানা গ্রাম থেকে বিতারিত হ'য়ে এখানে ট্রেক খুঁড়ে থেকে গেছলো—দীর্ঘকাল এখানে থাকবে ভেবেছিলো—কিন্তু, মৃত্যু গাছের সাথেই তাদেরও ধলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। ভূপাতিত পাইনের গুড়ির আড়ালে জার্মানরা ম'রে পড়ে ছিলো—তাদের বিকৃত দেহ ফাঁপ আর ব্র্যাকেনের সজীব টাটকা সবুজের মাঝে প'চছে। গেল-বিদীর্ণ পাইনের ধূপগন্ধী স্নগন্ধও সেই গলিত শবের শ্বাসরোপকারী তীব্র দুর্গন্ধ ঢাকতে পারছিলো না। পৃথিবীও তার ধূসর পাটকেলী রঙের গভীর শেলস্কতগুলো থেকে যেন কবরের গন্ধ ছাড়ছে...

শেল-চূর্ণিত সেই ফাঁকা জায়গায় দীর্ঘ এবং জমকালো ভজাতে মৃত্যু তার ছায়া বিস্তার ক'রেছে। ঠিক ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উপায়ে রক্ষাপ্রাপ্ত এক নিঃসঙ্গ রূপালী বার্চগাছ। বাতাস তার স্প্রিংটার-বিস্কৃত শাখায় দোলা দিয়ে ঝকঝকে শিরিষের মত কিশলয়ের ভেতর দিয়ে ফিস্ ফিসিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা ফাঁকা জায়গাটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সামনের তরুণ সিগন্যালারটি গাছের গুড়িটার আঙ্গুল বুলালো। অকপট-স্নেহাত' বিশ্বের জিগ্রেস করলে সে : হে বন্ধু, কি ভাবে টিকে ছিলে তুমি এর ভেতর ?

কিন্তু, সেল-আহত একটা পাইনগাছ যদি এভাবে মারা যায়—যেন একটা কুড়োল দিয়ে কেউ তাকে শেষ ক'রেছে—ওধু পাইন-নির্ধার্স তার

গা বেয়ে চুইয়ে প'ড়ছে—তাহলে একটা ওকগাছের বুড়ার ধরণটী হ'বে আলাদা।

একটা অনামী নদীর পাড়ে এক বুড়ো পাইন গাছের কাছে একটা জার্মান শেল পড়ে। সেই গভীর আঘাতের ফলে গাছটার অর্ধেকটা নিজীব হ'য়ে যায়—কিন্তু, বাকী অর্ধেকটা বিস্ফোরণের ফলে জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বসন্তে অপূর্ব সজীবতায় সে ঘন পাতায় সম্ভিত হ'য়ে ওঠে। আশ্র পর্বন্ত, নিঃসন্দেহে, সেই আহত গাছের নীচু শাখা প্রশাখা নদীর স্রোতে স্নান ক'রে যাচ্ছে, আর উপরের শাখায় দল আগ্রহভরে তাদের ধারালো অনিচ্ছুক অবিকশিত পাতাগুলোকে স্বর্ধালোকের দিকে তুলে ধরে আছে।

* * *

লম্বা, ঠেং ঝুঁকে-পড়া, উঁচু, চওড়া কাঁধওয়ালা লেফটেন্যান্ট জেরাসিমভ ভাগ আউটের প্রবেশ দ্বারে বসে ছিলেন। আজকের লড়াইএ তার ব্যাটেলিয়ান শত্রুর ট্যাক আক্রমণ কি করে প্রতিহত করে—তারই বিবরণ দিচ্ছিলেন।

তার শীর্ণ মুখ স্থির অচঞ্চল ছিলো—প্রায় উদাসীন ব'ললেও চলে। উজ্জল চোখ দুটো তাঁর ক্লান্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিলো। গভীর এবং কর্কশধরে কথা ব'লছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর বড় বড় গিঁটওয়ালা আঙ্গুল পরস্পরের সাথে জড়া জড়ি ক'রছিলো। তাঁর বলিষ্ঠ কাঠামো, তাঁর পুরুষোচিত বলিষ্ঠ মুখের সাথে সেটা যেন একেবারে বেমানান। হাবভাবে অব্যক্ত হুঃ এবং গভীর বেদনাদায়ক চিন্তার পরিচয় দিচ্ছিলেন তিনি।

হঠাৎ তিনি কথা থামিয়ে ফেললেন—তাঁর মুখের উপর একটা পরিবর্তনের ছায়া নেমে এলো। জলপাইয়ের মত গাল দুটো ক্যাকাশে হ'য়ে গেলো—পেণ্ডের হাড়ের নীচেকার গভীর মাংসপেশী কঁকড়িয়ে

সৈন্য—সমুখের দিকে প্রসারিত স্থির দৃষ্টি এমন ভয়ঙ্কর রকম, অপ্রতি-
রোধ্য স্থণায় বলকে উঠলো যে, আমি অনিচ্ছার সাথেও তাঁর দৃষ্টির
অর্জস্বরূপ ক'রতে লাগলাম। আমাদের নিকটস্থ ডিফেন্স লাইন থেকে
জিইজন জার্মান বন্দী বনের মাঝ দিয়ে চ'লেছিলো। তাদের পেছনে
একজন লালসেনা। গায়ে একটা সামার টিউনিক রোদে রোদে প্রায় সাদা
হ'য়ে গেছে—মাথার পেছনে একটা ট্রেক ক্যাপ।

লালসেনাটি অলসগতিতে এগিয়ে চলেছে—তার পায়ের তালের সাথে
জাল মিলিয়ে হাতের রাইফেল ছলছে—ছুরির ফলার মত বেয়নেট
স্বাধীনলোকে অকমক করছে। হ'লদে কাদায় দাগ-ধরা ছোট বট পায়ে
জার্মানরাও শিথিল গতিতে এগিয়ে চলছে।

পুরোবর্তী জার্মানটি (একজন বহুস-ভারী লোক, ভাঙ্গা গাল দুটো
জয়োরের কুঁচির মত পাটকেলী রংএর দাড়ীতে আচ্ছন্ন) যেতে যেতে
ভাগ আউটের দিকে এক বলক নেকড়ের দৃষ্টি হানলো, তারপর ঝট
ক'রে মুখ ফিরিয়ে বেণ্ট-এর সাথে সংযুক্ত উল্লীষটিকে ঠিকমত বসালো।
লেফটেন্যান্ট জেরাসিমভ লাফিয়ে উঠে লালসেনাটিকে চীৎকার ক'রে
ভাঙতে লাগলেন :

“ক'রছো কী তুমি ? ওদের কি হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছো না
কি ? যাও, চটপট হেঁটে চলে যাও।”

তিনি আরও কিছু বলতে চাইছিলেন ঠিকই—কিন্তু উদ্বেজনার
হ'লিয়ে উঠলেন। চট ক'রে ফিরে তিনি সিঁড়ি বেয়ে 'ভাগ আউটের' মধ্যে
ঝেমে গেলেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টা ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন যিনি—
আমার সঙ্গী বিস্মিত চাহনির জবাব দিতে এগিয়ে এলেন খেচ্ছায়।

“উপায় নাই”—ফিস্ ফিস্ করে বললেন তিনি। ওঁর আত্মর বিকার।
জার্মানদের বন্দী ছিলেন উনি—জানেন না ? ওঁর সাথে মাঝে মাঝে
কথা বলবেন। ভয়ঙ্কর রকম হুঁতোগের মধ্যে ছিলেন উনি সেখানে—

তাই, স্বভাবতই একজন জীৱন্ত জাৰ্জানকে সৰু ক'ৰন্তে পাবেন নট
তারপর থেকে— হ্যা, বিশেষ করে একজন তাজা জাৰ্মান। হুতদের দেখলে
তিনি নিবিকারই থাকেন—ব'লতে কি, তিনি কিছুটা আনন্দই পান
তা'তে—কিন্তু, যেই বন্দীরা চোখে প'ড়লো, অমনি, হয় তিনি চোখ বন্ধ
ক'রে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, হুতের মত বিবৰ্ণ হ'য়ে যাবে তাঁর মুখ
—নয়তো, সেখান থেকে সরে পড়বেন।”

রাজনৈতিক উপদেষ্টা আরও কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁর গলার স্বর
আরও খাদে নেমে এলো। “আমি ওর সাথে দুবার লড়াইয়ে গিয়েছি।
ঘোড়ার মত বলিষ্ঠ লোকট'। উনি কি কবেন আপনার একবার দেখা
উচিত। আমার সময়ে একবার কি দুবার চোখে পড়েছে—রাইফেলের
কুঁদো আর বেয়নেট নিয়ে উনি যা করেন—আপনাকে বলছি আমি, সে
একটা ভীষণ ব্যাপার।

*

*

*

সেই রাতে জাৰ্মান বড় কামানগুলো আগুন ঢালতে লাগলো।
মাঝে মাঝে একটানা ভাবে দুব দুব শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে—কয়েক
মিনিট পরেই নক্ষত্রখচিত আকাশে শেলের টুকরোর হিস্ হিস্ শব্দ শোনা
যায়। দুব দুব শব্দ ক্রমে জোর গজনে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে
মিলিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পেছনে ওই বড় রাস্তাটার দিকে (যে
রাস্তাটা দিনের বেলায় যুদ্ধ সীমান্তে অস্ত্র শস্ত বহনকারী ট্রাক প্রভৃতিতে
ভর্তি হয়ে থাকে) এক ঝলক হলুদ আগুনের শিখা দেখা দেয় আর
তারই সাথে বজ্রের আগুজের মত বিস্ফোরণ।

বিস্ফোরণের মাঝে মাঝে যখন বনের মাথায় নিস্তব্ধতা আবার নেমে
আসে, তখন মণার গুণ গুণ আর কাছের জলাভূমি থেকে ব্যাঙের গাঁ গাঁ
শব্দ শোনা যায়।

একটা ছাজেল ঝোপের নীচে আমরা শুয়ে আছি। লেফট্যানাণ্ট

জেরাসিমভ গাছের ডাল দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে তাঁর গল্প শোনাচ্ছিলেন। যতদূর মনে আছে তাঁর গল্পটা আমি এখানে বলছি :

“যুদ্ধের আগে পশ্চিম সাইবেরিয়ার এক মিশে আমি একজন মেকানিক ছিলাম। গতবছর ঠিক ২২ জুলাই আমাকে তলব করা হয়। স্ত্রী আর দুটো শিশু নিয়ে আমার পরিবার—বাবাও আছেন, তবে তিনি পক্ষি বিদ্যায় দেবার সময় স্ত্রী স্বতাবতই একটু ক্রোড়েছিলেন। বিদায়কালীন উপদেশ দিতে দিতে পথের উপর ছুটে এসে বলেছিলেন, “তোমার দেশ এবং দেশবাসীকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করো। দরকার হলে জীবন বিসর্জন দিও, তবু জয়লাভ আনাদের করতে হবে।” বললাম তাকে, “তোমাকে কি ভাবো তুমি—আমার স্ত্রী, না একজন পারিবারিক প্রচারক? আমাকে কি করতে হবে না হবে সে সম্বন্ধে ভাববার মত আমার বয়স হয়েছে। আর যুদ্ধ জয় করা সম্বন্ধে? ক্যাসিটদের গলা টিপে সেটা আদায় করবো—সেজন্তু তুমি ভেবে না।

“আমার বাবা অবশ্য খুব শক্ত লোক; তবু তার কাছ থেকে বিদায় উপদেশ না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। ‘মনে রেখো ভিক্টর,’ তিনি বললেন, ‘জেরাসিমভ নাগটা বড় যে সে নাম না—মজুর বংশের উত্তরাধিকার তুমি—তোমার ঠাকুরদাদাব ঠাকুরদাদা স্ট্রোগানভে কাজ করতো। শত বছর ধরে দেশের প্রয়োজনে আমাদের বংশ লোহা উৎপাদন করে আসছে—তোমাকে লোহার মতই হতে হবে এ যুদ্ধে। আমাদের গবর্ণমেন্ট আমাদেরই গড়া। যুদ্ধ বাধার আগেই তোমাকে বিজার্ডের কমাণ্ডার করা হয়েছে—শত্রুকে ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে সেটা।’

“আমরা তাই বুঝাবো” বললাম আমি।

“ট্রেনারের পথে ভিত্তিক প্যাঁহেভকোয়াটারে একবার গেলাম। আমাদের সেক্রেটারী একজন কাটখোটা বাস্তববাদী লোক। উজ্জ্বল নেই তাঁর। বললাম আমার স্ত্রী আর বাবাই যদি বিদায়ী উপদেশ কিছু না দিয়ে

ছাড়েন নি, তখন এ তরলোক অন্তত আধঘণ্টা ধরে উপদেশ-বাণী শোনা যেন। হলো ঠিক তার উল্টো। ‘বসো জেরানিমোভ,’ বললেন তিনি, ‘সেকালে কোনখানে যাবার আগে অন্তত দু এক মিনিট বসে যেতে হতো।’

“একটু বসলাম আমরা। তারপর তিনি উঠে পাড়ালেন—তার চশমাটা কেমন ঝাপসা দেখালো……তাবল্যাম, কত অভূত ব্যাপারই না আজ ঘটছে। এর পর তিনি ব’ললেন, ‘বলবার বেশি কিছু নেই কমরেড্ জেরানিমভ। যখন তুমি পাইওনিয়ারের (একটা বয়েস পর্যন্ত ছোট ছোট কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন ছেলে মেয়েরা পাইওনিয়ার দলের অন্তর্ভুক্ত থাকে—তখন তারা কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হ’তে পারে না) লাল রুমাল বেঁধে বেড়াতে, সেই এতটুকু কাল থেকে তোমাকে চিনি। পরে লীগ মেম্বর (আর একটু বেশি বয়েসী ছেলেদের প্রতিষ্ঠান) হিসেবেও তোমার কথা মনে আছে—তারপর, পার্টি মেম্বর হিসাবেও আজ দশ বছর থেকে তোমাকে জেনে আসছি। ওই জার্মান শূয়ারদের কোনরকম দয়া দেখিও না। তোমার ওপর পার্টির বিশ্বাস আছে।’ জীবনে এই প্রথম আমরা পুরণো রুশ প্রখ্যাতবাদী পরস্পরকে চুমু দিলাম। যাই হোক সেক্রেটারীকে ঠিক সেই শুকনো লাকড়ির মত মনে হ’লো না অন্তত।

“তার সম্মুখে ব্যবহারে এতই উচ্ছৃঙ্খল হ’লাম যে, ভিত্তীকৃত কমিটির অফিসের বাইরে এসে বেশ আনন্দ ও ভাবান্তর বোধ করলাম। স্ত্রীও আমার মনের প্রফুল্লতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলো। বেশ বুঝতে পারেন যে, স্বামীকে ক্রুটে বিদায় দেওয়া কোনও স্ত্রীর পক্ষেই আনন্দের কাজ নয়। সেও একটু ভেঙ্গে প’ড়েছিলো বৈকি? কোন জরুরী একটা কথা সে বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু তার মাথা থেকে সেটা একেবারেই উধাও হ’য়ে যায়। ট্রেন সবেমাত্র চলতে আরম্ভ ক’রেছে—পাশে পাশে সে ছুটেছে। আমার হাত ছাড়তে চায় না—কেবলই সেই কথার পুনরাবৃত্তি।

‘ফ্রিটের দিকে একটু নজর রেখো তিসিয়া—ফ্রন্টে গিয়ে যদি লাগিতো না যেন।’ ‘তাল, নাদিয়া! তুমি আমাকে জ্ঞাবো কী বলতো? যদি লাগার কথা আমি তাবিই না। জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর—আর, বেশ মাঝামাঝি আবহাওয়া তো ওখানকার।’ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার কষ্টই হচ্ছিলো; তার অর্থহীন মধুর কথাগুলো আমি চমৎকার বোধ করছিলাম। তারপরে, জার্মানদের ওপরে একটানা স্থির ক্রোধের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করলো।”.....

.....কয়েক মিনিট তিনি নীরব রইলেন—সামনের দিকে মেসিন-গানের গুলি বিনিময় লক্ষ্য করছিলেন তিনি। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা আরম্ভ হ’য়েছিলো, ঠিক তেমনি ভাবেই সেটা থেমে গেলো।

‘যুদ্ধের আগে জার্মান থেকে কলকজা আনতাম আমরা। ১২নে আছে যখন তার টুকরোগুলো আমি জড়ো করতাম, তখন প্রত্যেকটিকে অন্তত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচ ছ’ বার পরীক্ষা করতাম। হৃদক হাত নিঃসঙ্গেই সেগুলো তৈরী করেছে। জার্মান লেখকদের বই আমি পড়তাম—আর, যে জন্মেই হোক, জার্মান জাতিকে আমি শ্রদ্ধা ক’রতাম। মাঝে মাঝে সত্যি ভাবতাম, একটা জাত ওরকম প্রতিভাশালী এবং পরিশ্রমী হয়েও কি ক’রে হিটলারের নীতিকে সমর্থন করে.....কিন্তু, সেটা তাদের ব্যাপার...—তারপরে পশ্চিম ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধে.....

‘এইভাবে আমি ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে চললাম। এটা না তেঁকে পারছিলাম না যে, ওদের সৈন্য খুবই চমৎকার এবং শিল্পকাজেও ওরা খুব হৃদক। ওই রকম শত্রুর সাথে ঝগড়া করা এবং তার পাজরা তেঁকে দেওয়াটা সত্যিই খুব মজার। ১৯৪১ সালে অবশ্য আমরা এত সরল ছিলাম না। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবো যে, আমাদের শত্রুর কাছে কোনরকম সততা আমি আশা করি নি। কালিজম্‌এর কাছ থেকে কখনই সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু, তবু আমি ভাবতে পারি নি

যে, আমানদের মত নীতিহীন একটা দল্লানের সাথে আমানক লড়াই করতে হবে। সে কথায় গলে আসছি.....

“জুলাইএর শেষে আমাদের ইউনিট ফ্রন্টে পৌছয়। ২৭শে জোরে লড়াই আরম্ভ হলো। আমি এ বিষয়ে একেবার নতুন—তাই, একটু আতঙ্কজনক বলেই বোধ হলো। ট্রেকমর্টার দিয়ে তারা আমাদের উপর নরক সাজিয়ে তুললো—কিন্তু, সন্ধ্যার দিকে লড়াইটা আমাদের আয়ত্তে এলো, আঘাত হেনে ওদেরকে একখানা গ্রাম থেকে সরিয়ে দিলাম।

ওদের একদলকে—সংখ্যায় পনেরো জন তারা—আমরা ঘিরে ফেললাম। আমার সেটা স্পষ্ট মনে আছে—যেন এইমাত্র সেটা ঘটেছে। তাদেরকে নিয়ে আসা হলো—ভীত এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিলো তাদের। ততক্ষণ আমাদের লোকজন শান্ত হয়ে গেছে। যে যা পারে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বন্দীদের জন্যে নিয়ে এলো, কিছু তামাক অথবা সিগারেট—কেও বা ওদের পিঠ চাপড়াতে লাগলো এবং ‘কমরেড’ বলে তারা সম্বোধন করছিলো। ‘কি জন্যে লড়াই করছো তোমরা, কমরেড’—এবং এই ধরনের কথাবার্তা।

“আমাদের মধ্যকার বহু বছরের অভিজ্ঞ একজন লোক এই মর্মস্পর্শী জুড় কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বললো, ‘তোমাদের এই সব বন্ধুদের অত মন জোগাবার দরকার নেই হে! এখানে তারা সবাই ‘কমরেড’! একটু দেরী করো না, ওদের সীমান্তের পেছনে ওরা আমাদের আহত লোকজনের সাথে কেমন ব্যবহার করে তা দেখতে পাবে।’ যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল সে আমাদের মাথায় ঢেলে দিয়েছে—তার কথায় ঠিক এমনই ফল হলো। তারপরে সে চলে গেলো।

“নীগনিরই আমাদের সৈন্যরা আক্রমণ আরম্ভ করে—তারপরেই আমরা ঠিক দেখতে পেলাম ওদের কীতি কলাপ।.....গ্রামকে গ্রাম স্ট্রিটের সাথে যিশে গেছে—শত শত জীলোক, শিশু, বৃদ্ধকে গুলি করা

হ'য়েছে, বন্দী লাগসেনার বিকৃত লাস—দ্রীলোক, বালিকার (তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিশু মাত্র) উপর শাশবিক অত্যাচার ক'রে নৃশংসতাকে হত্যা করা হ'য়েছে ।

“বিশেষ করে একটা ঘটনা আমার মনে গেঁথে আছে : প্রায় এগারো বছরের একটা মেয়ে । জার্মানদের হাতে প'ড়বার সময় সে স্কুলে যাচ্ছিলো—তাকে বাগানের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলা হয় । একটা তাক্সা আলুর ক্ষেতের মধ্যে সে পড়ে ছিলো—নেহাংই বালিকা সে—শিশুও বলা চলে তাকে । রক্তমাখা বইগুলো তার চারদিকে ছড়ানো ।...তলোয়ারের গভীর ক্ষতওয়ালা তার মুখটা বীতংস দেখাচ্ছিলো । তখনও তার হাতের মুঠোয় স্কুলের চামড়ার ব্যাগটা রয়েছে খোলা । কাপড় দিয়ে তার শরীরটা ঢেকে দিয়ে দু' এক মিনিট নিঃশব্দে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম । তারপর নিঃশব্দেই সবাই চলে গেলো একে একে । কিন্তু, আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম । বেশ মনে আছে, আচ্ছন্নের মত ফিস্ ফিস্ করে বার বার পড়তে লাগলাম—‘বার্কভও পোলো ভিন্কিন্—ফিজিক্যাল জিওগ্রাফী রীডার ফর হায়ার গ্রেড্ স্কুলস্—ঘাসের মদিয়াকার একটা বইএর নাম—বইটা আমি চিনতাম । কারণ, আমার নিজের মেয়েটাও তো ফিফ্ থ ফর্মে পড়ে..... ।

“ঘটনাটা কবিনের কাছে ঘটে । স্মিরিতে ফাঁসীর জায়গাটা ছিলো একটা খাদের মধ্যে । এটা হ'চ্ছে, যেখানে বন্দী লাগসেনাদের উৎপীড়ন করে হত্যা করা হয়, সেই জায়গাটা । আপনারা নিশ্চয়ই কসাইএর দোকান দেখেছেন ! দেখে থাকলে জায়গাটা সম্বন্ধে আপনাদের একটা ধারণা হবে ।.....

“খাদের মধ্যে জন্মানো গাছের কাণ্ডে রক্তাক্ত দেহগুলো ঝুলছে । হাত পা গুলো কেটে ফেলা হয়েছে—গায়ের চামড়া তোলা.....আরও আট জনের দেহ গাছের নীচে গাদাগাদি হয়ে পড়ে রয়েছে । বুঝতে

পারবেন না, কোন্ অংশটা কার শরীরের—ঠিক যেন একতুপ মাংসকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হ'য়েছে.....।

“তাবছেন, যা কিছু দেখেছি সব তাবায় প্রকাশ করা চলে—না।” অসম্ভব! বর্ণনা করার মত তাবা নেই। আপনাকে নিজেকেই সেসক দেখতে হবে। হ্যাঁ, এখন প্রসঙ্গ বদলানো দরকার”—লেকটেন্যান্ট জেরাসিমভ্ অনেকক্ষণ ধরে আর শব্দ ক'রলেন না।

“এখানে কি ধূমপান করা যায়?”, ত্রিজেন্স ক'রলাম। “নিশ্চয়ই—কিন্তু, আলো যেন দেখা না যায়,” তাক্সা গলায় তিনি বললেন। নিজেকে আশুন জেলে নিয়ে বলতে লাগলেন :

“জার্মানরা যা করেছে সে সব দেখার পরে আমরা নিজেরাই অনেকটা ক্ষেপে গেছি। এটাই আশা করা চলে শুধু। সবাই আমরা মনে করে থাকি যে, রক্ত-পিপাসু নৃশংস পশুর সাথেই আমাদের কারবার—মানুষের সাথে নয়। এটা খুবই পরিষ্কার যে, জার্মানরা কলকজ্ঞা প্রভৃতি যেমন নিপুণতার সাথে তৈরী করে থাকে, আমাদের দেশবাসীর হত্যায়, মেয়েদের সতীত্বনাশের বেলায়, তাদের সেইরকমই নিপুণতা।...আমাদের আবার পিছিয়ে আসতে হয়—কিন্তু, দানবের মতই আমরা আগাগোড়া লড়াই করে আসছি।

“আমার কোম্পানীর সব লোকই প্রায় সাইবেরিয়ান। কিন্তু ইউক্রেনের প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্যে আমরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করি। আমার অঞ্চলের বহুলোক ইউক্রেনেই মারা গেছে। কিন্তু, জার্মানদের তার চেয়েও বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা মাটি ছেড়ে এসেছি সত্যি—কিন্তু, তবু, তাদেরও গরম গরম দিতে ছাড়ি নি।”

সিগারেটে দু'একটা টান দিয়ে তিনি তির হুয়ে কথা বলতে লাগলেন।

“ইউক্রেনের সুন্দর মাটি—পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও মনোরম। প্রতি গ্রাম প্রতিটি কুতীর আমাদের কাছে আপনার ব'লে মনে হয়। হতে পারে

এদের আত্মরক্ষার জন্তে আমরা রক্ত ঢালতে কার্পণ্য করি নি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে এবং লোকে বলে, জ্বলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ... যে কোন একটা গ্রাম ছেড়ে আসার সময় আগাদের অন্তরে ব্যথা লাগতো—ব্যথা লাগতো ঠিক শয়তানের মতই। দুঃখ—প্রচণ্ড রক্তম দুঃখ বোধ করতাম আমরা। একটা জায়গা ছেড়ে যাবার সময় আমরা পরস্পরের চোখে চোখে চাইতে পারতাম না।

“সে সময় ভাবতেই পারি নি আমাদের আবার জার্মানদের বন্দী হতে হবে কোনদিন। কিন্তু তাও হতে হয়েছিলো। সেপ্টেম্বরে সর্ব প্রথম আমি আহত হই—কিন্তু, তবু, আমার কোম্পানীর সাথেই আমি থেকে গেলাম। পোন্ডাভা অঞ্চলের ভেনিসোভকীর চার পাশে লড়াইএর সময় আমি ২১শে তারিখে আবার আহত হই। বন্দীও হই আমি।

“জার্মান ট্যাঙ্ক আগাদের বাম বাহু ভেদ করে ঢুকে পড়ে—আর তাদের ঠিক পাছে পাছে আসে পদাতিক বাহিনী। পরিবেষ্টিত হয়েও আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকি। সে দিন আমাদের কোম্পানীর গুরুতর ক্ষতি হয়। দুবার ট্যাঙ্ক আক্রমণ আমরা হটিয়ে দিই, আরও কতকগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিই এবং ক্ষতিগ্রস্ত করি।.....মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শেল আসছে। মনে আছে, আমাদের লোকজনের এতই তেষ্ঠা পেয়েছিলো যে তাদের ঠোটগুলো কালো হয়ে ফুলে ওঠে। ভাঙ্গা গলায় আমি আদেশ দিচ্ছিলাম—নিজের গলার স্বরকে নিজেই চিনতে পারছিলাম না আমি। খোলা জায়গা দিয়ে যাবার সময় একটা শেল আমার সামনেই ফাটলো। আমার আবছা আবছা মনে পড়ে, কালো মাটি আর ধুলোর একটা স্তম্ভ—বাস, আর কিছু না। একটা শেলের স্প্লিণ্টার আমার উষ্ণ তেজ করে চলে গেলো; দ্বিতীয়টা রক্ত আমার ডান কাঁধে বিধে যায়।

“জানি না কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিলাম—পায়ের শব্দে আমার চেতনা এলো। মাথা তুলে বুঝলাম, যেখানে পড়েছিলাম সেখানে আমি নেই। আমার টিউনিকটা নেই—খাড়টা যেমন তেমন করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। উকীষটাও উধাও হয়েছে।……চকিতে মনে হলো, আমার লোকজনেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে নিয়ে যাবার সময় পথে ব্যাণ্ডেজ করেছে। বহু কষ্টে মাথা তুলবার সময় আমি তাদেরই দেখবার আশা করছিলাম। কিন্তু, আমার দিকে দৌড়িয়ে আসছিলো যারা, তারা আমার লোকজন নয়, তারা জার্মান!……তাদেরকে এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—যেন সিনেমার কোন ছবি আর কি! চারপাশে হাত-ডাঙাতে লাগলাম—রিভলভার বা রাইফেল, এমন কি, একটা হাত বোমাও হাতের কাছে পেলাম না। আমারই কোন লোক হয়তো আমার অস্ত্রশস্ত্র এবং ডেসপ্যাচ কেসটা নিয়ে নিয়েছে।

“তা’হলে এই শেষ”—মনে মনে তাবলাম। এ ছাড়া আর কি তাবতে পারি সে সময়? আপনার কর্তনায় যা আছে, সেটা যদি কোন আগামী উপন্যাসের উপাদান হয়, তবে শূন্যস্থানটা পূর্ণ করি নেবেন। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক সেই মুহূর্তেও কথা ছাড়া অন্য কিছু তাবার সময় ছিলো না। জার্মানরা কাছেই রয়েছে—আর, আমিও শুয়ে শুয়েই মরতে রাজী ছিলাম না। আদৌ সে রকম কোন ইচ্ছা ছিলো না।……প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটু ভর করে উঠলাম। স্থিরভাবে বজায় রাখার জন্যে হাত দুটো দিয়ে মাটি ছুঁয়ে থাকলাম।

“তারা পৌছবার আগেই আমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছি। ইয়া, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম—না দুটো একটু কাঁপছিলো—ভয়ও হচ্ছিলো প্রচণ্ড যে, যে কোন মুহূর্তে হাঁটু তেজে পড়ে যাবো; আর, একবার নীচু হ’লেই ওরা বেরনেট দিয়ে আমাকে শেষ করবে। একটা মুখও আমার এখন মনে পড়ে না। তারা আমাকে স্থিরে দাঁড়িয়ে

বকছিলো এবং হাসছিলো। ‘মেরে কোনো আমাকে কালো প্রহরীর দল। আমার পড়ে যাওয়ার আগেই তোমরা আমাকে গেরে সব চুকিয়ে দাও’—ব’ললাম আমি। একজন আমাকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মাথায় মারলো—কিন্তু, আমি তবু খাড়া হ’তে পেরেছিলাম। হো হো ক’রে হেসে উঠলো তাবা। একজন হাত নেড়ে যেন এই ইশারা করলো—চলে যাও। আমি চলতে লাগলাম।

“মাথার আহত স্থান থেকে রক্ত পড়ে মুখ ঢেকে গেছে। গরম আর চটচটে রক্ত অবিরত পড়ছে। কাঁধটা আমার ব্যথা করতে লাগলো। ভান হাত উঠাবার শক্তি নেই। এখনও মনে আছে, আমার একমাত্র ইচ্ছা হ’চ্ছিলো তখন সেখানেই শুয়ে পড়া—মার একটুও না নড়া—কিন্তু তবু, তবু আমি এগিয়ে চলেছি

“না, মরবার কোন ইচ্ছাই আগার হয়নি—বন্দী হ’য়ে থাকা ভো দূরের কথা। প্রচণ্ড চেষ্টায় অবসাদ আর অক্ষমতার সাথে সংগ্রাম ক’রেই আমি এগিয়ে চলেছি—এখনও আগাব জীবনীশক্তি আছে—এখনও আমি সংগ্রাম করতে পারি। কিন্তু, উঃ, কি তৃষ্ণা! জ্বিত শুকিয়ে কাঠ হ’য়ে গেছে—একটা কালো কুয়াসাব পদা চোখের সামনে ভাসছে যেন। অজান হবার মত অবস্থা আমাব—তবু ভাবতে ভাবতে চলেছি—কিছুটা পানীয় পেলেই, একটু বিশ্রাম নিতে পারলেই আমি ছুটবো! আবার ছুটবো!

“বন্দীরা সবাই বনের প্রান্তে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ওরা আমাদেরই পাশের ইউনিটের লোক। আমার ইউনিটের শুধু দুজন সৈন্যকে আমি চিনলাম—ওনং কোম্পানীর লোক ওরা। অধিকাংশ বন্দীই আহত। একজন জার্মান লেকটেন্যান্ট ভাঙা ভাঙা কল ভাবায় ভানতে চাইল, আমাদের তেহর কোন কমিসার অথবা কণ্ঠাভাঙ্গ আছে কিনা। কিন্তু কোন উত্তর নেই।

লেকটেন্যান্ট তারপর চীৎকার করে উঠল, ‘কমিশনার আর অফিসার, দু’পা সব এগিয়ে যাও।’ তখনও কারও সাড়া নেই।

“লেকটেন্যান্ট আস্তে আস্তে লাইনের সামনে এগিয়ে গিয়ে ইহুদির মত দেখতে পনেরো ঘোল জন লোককে বের করে নিল। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি জুডা?’ উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাদের লাইনের বাইরে যেতে হুকুম করল লেকটেন্যান্ট। যাদেরকে বেছে নেওয়া হলো তারা শুধুই ইহুদি নয়—তারা অগ্নিনিয়ান, তাবা রাশিয়ান—অবস্থা-ক্রমে এদের পাটকেলী রং, চুল কালো। একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের চোখের সামনেই তাদের অটোমেটিক দিগে গুলি করে মারা হ’লো। তারপর আমাদের এলোমেলো ভাবে তল্লাসী করা হ’লো। পকেট বুক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে আগর বাক্তিত হ’লো। পাটি কাভ’ পকেট বুক করে নিয়ে বেড়ানোর ‘অভ্যাস আমার কোনদিনই নেই। আমার প্যাটের ভেতরের পকেটেই সেটা থাকতো—তাই, তারা সেটা দেখতে পায় নি। তাবলে মাতৃশব্দে অভ্যুত জীব ব’লেই মনে হয়! আগি নিশ্চিত জানতাম, আমার জীবন সূতোর আগায় মূলছে—পালাতে চেষ্টা করার সময় না মরলেও পথের মাঝেই আমি মারা প’ড়বো (যে রকম রক্ত পড়েছে)—কিন্তু, তল্লাসী শেষ হবার পরে যখন বুঝলাম যে পাটি কাভ’টা তখনও আছে—এতই আনন্দ হ’লো যে, আমি তুফার কথা ভুলেই গেলাম।

“সার বেঁধে আমাদের পশ্চিমদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। শক্তি-শালী পাগরানার সৈন্য রাস্তার দুপাশে মোতায়েন—তাছাড়া, উজ্জ্বল-খানেক মোটর-সাইক্লিষ্ট গেছেন। খুব তাড়াতাড়ি চলতে হ’চ্ছে আমাদের। আমার শক্তি ক্রত ফুরিয়ে আসছে। দুবার পরে গেলাম—কিন্তু, প্রতিবারই মাটিতে তর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম—কেননা, আমি জানতাম, প্রয়োজনের বেশী এক মিনিট দেরী

করলেই ওরা চলে যাবে এবং আমাদের রাস্তার মধ্যে গুলি করে মারা হবে। আমার সামনে একজন সার্জেন্টকে ঠিক তাই করা হ'লো। পায়ে আঘাত লাগার জন্যে সে হেঁচড়েও আর চ'লতে পারছিলো না। ভীষণভাবে সে কাতরাচ্ছিলো—মাঝে মাঝে ব্যথায় চীৎকার ক'রে উঠছিলো। প্রায় মাইলখানেক চলার পর সে আত'নাদ ক'রে উঠলো : না, আর পারি না। বিদায় ক'রেড! রাস্তার মাঝখানে সে ব'সে পড়লো।

“কেউ কৈউ তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করলো ; কিন্তু, সে মাটির ওপর আবার পড়ে গেলো। স্বপ্নের মতই তাকে মনে হয়—মলিন একখানা মুখ, তাতে ক্র দুটি কৃষ্ণিত, ব্যথার অশ্রুতে চোখ পরিপ্লুত। দলটি এগিয়েই চলেছে। সে পেছনে পড়ে গেলো। চারদিকে চেয়ে আমি মোটর সাইকেলারোহী একজন লোককে ওর কাছে এগিয়ে যেতে দেখলাম। বাইক থেকে না নেমেই সে সার্জেন্টের কানের কাছে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে গুলি করলো। নদী পৌছবার আগে জার্মানরা ওইরকম পেছিয়ে-পড়া আরও জন কয়েক লাল সৈনিককে গুলি করেছে।

“নদী দেখা যাচ্ছে—দেখা যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রীজ আর একখানা ট্রাক—পারাপারের পথের পাশে সেটা মাটির ভেতর পুতে আছে। ঠিক সেই জায়গায় আমি মুখ খুবড়ে পড়ে গেলাম। মূর্ছিত হয়েছি নাকি ?.....যন্ত্রণায় দাঁত কড়মড় ক'রছি—দাঁতের ফাঁকে বালুয় কণা কচ্চ্ ক'রছে। তবু উঠতে পারছি নে। ক'রেড! পাশ কাটিয়ে যায়। একজন ফিস ফিস ক'রে বলে উঠলো, উঠে পড় চটপট—নইলে শেষ করে ফেলবে ওরা। নখ দিয়ে মুখ চিরে ফেলার চেষ্টা করলাম, চোখের মণির উপর প্রাণপণে চাপ দিলাম বাতে যন্ত্রণার অধিক্য আমাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে.....

“দল চলে গেলো। মোটরবাইকের শব্দ শুনে পাজি—আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টায় কোনরকমে উঠে দাঁড়ালাম। মোটর সাইকেলারোহীর দিকে না চেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে দলকে ধরবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করলাম। নদী পার হ’তে হ’তে ট্রাকগুলো জলের নীচের কাঁদা তুলে ফেললো, তবু তৃপ্তির সাথে সেই উক—পাটকেলী রংএর জল পান করলাম। টাটকা ঝরণার জলের চেয়েও সেটা স্বাস্থ্য মনে হলো। মাথায় আর কাঁধে জল ছিটিয়ে দিলাম। অনেকটা সজীব বোধ ক’রছি। আশাতত এই আশায় চলতে পারি যে, রাস্তার মাঝে আর পড়ে থাকবো না।...

“নদী শিছনে কেলেছি কি একটা মাঝারি ট্রাকের সার আমাদের চোখে পড়লো। সবচেয়ে প্রথম ট্রাকের ড্রাইভার, বন্দী দেখে, পূর্ণ গতিতে আমাদের মাঝ দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিলো। সামনের সারির ফ্লোকজন তার চাপে পিষ্ট হয়ে গেলো। মোটর সাইক্লিষ্টরা এবং দলের অন্যান্য জার্মান সেই দৃশ্য দেখে হেসে কুটপাট। ট্রাকদ্রুদের তারা কি যেন বললে। ট্রাকদ্রুরা ট্রাকের ফোকর গলিয়ে মাথা বের ক’রে তাদের হাত নাড়ছিলো। তারপর আমাদের লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চ’ললো। হ্যাঁ, জার্মানদের বিশেষ এক ধরনের রসিকতাবোধ আছে বটে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।।......

“সেই সন্ধ্যায় অথবা রাতে আমি পালাবার কোন চেষ্টা করি নি। —কেননা সে বিষয়ে আমি অক্ষম ছিলাম। রক্তক্ষরণের ফলে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাছাড়া, আমাদের ওপর কড়া নজর রাখা হ’য়েছে—সেই পালাবার ফলাফল খারাপ হবারই সম্ভাবনা। কিন্তু শেষে কতই না শাপশাপাত ক’রেছি নিজের ওপর—চেষ্টা না করার জন্য। পরদিন সকালে জার্মানদের এক বাঁটির তেতন দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ’চ্ছিলো।যেসক জার্মান লৈন্য একটু আসছিলো তাদের সামনে

আমাদের লজ্জা দিতে চেয়েছিল ওরা।.....যে কেউ পেছনে পড়ে থাকলে অথবা পড়ে গেলে তাকে গুলি ক'রা হ'তো। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা বন্দী-নিবাসে পৌঁছুই।

"এটা হচ্ছে আসলে মেনিন আর ট্র্যাক্টর ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ—বিদ্যুৎ-চালিত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। ক্যাম্প গার্ডের কাছে আমাদের জমা দেওয়া হ'লো। তারা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো ভেতর। বন্দীদের গাদাগাদি ক'রে রাখা হ'য়েছে। এটাতে নরক ব'ললে কিছুই বলা হয় না আর কি! পায়খানা নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়খানা ক'রতে হ'বে—তারপরে, বস বা শোওয়া ওই ময়লার মধ্যেই। আমাদের মধ্যে দুর্বল যারা তারা আর খাড়া হ'তে পারে নি। খাবার আর জল আমাদের একবারই মাত্র দেওয়া হ'তো। অর্থাৎ, এক মগ জল আর মুঠোখানেক কাঁচা জোয়ার অথবা সূর্যমুখী ফুলের বীচির গুঁড়ো—এই! কোন কোনদিন তারা আমাদের কিছু দিতে ভুলেই যেতো...

"দু' একদিন পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হ'লো। হাঁটু পর্যন্ত প্রায় কাদা উঠেছে। সকালে ভিজ়ে অবজবে মানুষজনের গা দিয়ে ঘোড়ার মত বাষ্প বের হ'তো। বৃষ্টির বিরাম নেইপ্রতি রাত্রিতে কয়েক ভজন ক'রে বন্দী মারা যেতো। খাবারের অভাবে আমরা ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে পড়ছি। ঘাএর যন্ত্রণায় আমার অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠলো।

"ষষ্ঠ দিনে বোধ হ'লো, আমার মাথা আর কাঁধ তরানক খাঁচা হ'য়ে পড়েছে। ঘায়ে পক্ষ শুরু হ'য়েছে। ক্যাম্পের পাশে ক্যালেকটিক কামের ঘোড়ার আস্তাবল—সেখানে তরানক তাবে আহত লাল সেনাদের রাখা হ'য়েছে। সকালে পাহারাওয়ালাদের সার্কেটের কাছে গেলার—জাকারের সাথে দেখা করার অসুবিধা চাইলে বলা হ'লো যে, জাকার

আহতদের সাথে আছেন। জার্মান এন্. সি. ও. রাশিয়ান ভালই বলেন—ব'ললেন, তোমাদের রাশিয়ান ডাক্তারের কাছে যাও। তিনিই বেশ সাহায্য করতে পারবেন।

“সেখটা তখন ধরতে পারি নি—অহমতি পেয়ে খুশী হ'য়ে আস্তাবলের দিকে যাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম।

“আমি ডাক্তারের সাথে দরজাতেই দেখা। দেখেই বুঝলাম, তাঁর অবস্থাও সন্নিহ। আহতরা সারের গাদায় পড়ে আছে—হুগছে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। অনেকের ঘায়েই পোকা কিলুবিলা ক'রছে—যাদের শক্তি আছে তারা নখ আর কাঠি দিয়ে সেই পোকা বাছছে পাশেই বন্দীদের মৃতদেহের একটা স্তূপ—পরিষ্কার করবার সময় নেই।

“‘চেয়ে দেখো!’ ডাক্তার ব'ললেন, ‘কেমন করে তোমাকে সাহায্য করি? একটা ব্যাগুজ অথবা কিছুই নেই। ভগবানের দোহাই—এখান থেকে চ'লে যাও। ওই নোংরা ব্যাগুজ জুসে দিয়ে ওখানে ছাই ছিটিয়ে দাও। দরজার কাছে খানিকটা টাটকা ছাই আছে।’

“ তাঁর উপদেশমত কাজ করলাম। জার্মান এন্. সি. ও. দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুখখানাকে বিদ্রুত ক'রে তিনি হাসছেন। ‘কি, কি রকম খবর? তোমাদের একজন চমৎকার ডাক্তার আছেন—হেঃ! কোন সাহায্য পেলে কি তাঁর কাছে?’ নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাড়ি—মুখের ওপর একটা খাবড়া মেরে চাঁৎকার ক'রে বলে উঠলেন, ‘কিরে শূয়ার, কথার উত্তর দিসনে যে তুই!’ প'ড়ে পেলাম। ক্রান্ত না হওয়া পৰ্যন্ত তিনি মাথার বুকে লাথি মারতে লাগলেন। বেঁচে থাকা পৰ্যন্ত সেই জার্মানটাকে জুগবো না—কখনও না। তার পরেও তিনি কয়েকবার আমাকে মেরেছেন। কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পেলেই তিনি আমাকে বাইরে নিয়ে আসার হুকুম করতেন—ক্রান্ত হয়ে নিঃশব্দে এবং মনোযোগে কিছু তিনি আমাকে মেরে যেতেন...

“তাবছেন, কি ভাবে টিকে ছিলাম ? যুদ্ধের আগে এবং মেকানিক হবার আগে পর্বত কামা নদীতে আমি মাল টানার কাজ করতাম। এক সময়ে বিরাট বিরাট দুই বস্তা লবণ আমি নিয়েছি। হ্যাঁ, আমি বেশ বলিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু, এখানে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে, আমি মরতে নারাজ ছিলাম—প্রতিরোধের ইচ্ছা আমার এতই জোরালো ছিলো। যারা দেশের জন্তে লড়ছে আমাদের মতো কিরে যেতে হবে—এবং শেষ পর্বত আমি কিরে গিয়েছিলামও শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

“সেই ক্যাম্প থেকে—ক্যাম্পটা ‘ডিক্লিবিউটিং সেক্টর’ (বেশের নানা-স্থানে বন্দীদের এখান থেকে পাঠানো হ’য়ে থাকে)—সত্তর আশী মাইল দূরে এক ক্যাম্পে আমাকে পাঠানো হ’লো। আগেরটার সাথে কোনই পার্থক্য নেই এর। সেই লম্বা লম্বা ধামে বিদ্যুত-চালিত কাঁটাতার খাটানো। বন্দীদের মাথার ওপর ছাদের বানাই নেই। খাবার প্রায় সেই ধরনের—কবল মাঝে মাঝে কাঁচা রোয়ালের জয়গায় শেদ্ধ করা (সম্ভবত) শস্ত খানিকটা দেওয়া হ’তো—অথবা, কোন মরা বোড়া টানতে টানতে নিয়ে এসে বন্দীদের ভাগ করে খেতে বলতো। যাতে না খেয়ে না মরি সেজন্যে তাই আমরা খেতাম—কলে, শত শত লোক তাতেই মারা গেলো.....তারপরে অবস্থা আরও ভীষণ করে তুললো শীতকাল এসে। অক্টোবরের অবিরল বৃষ্টি প’ড়ে চ’লেছে—সকালে তুষারপাত। শীতের হাতে নিম্নমভাবে কষ্ট পেতে লাগলাম। একজন বৃত্ত বন্দীর গা থেকে একটা টিউনিক আর কোট যোগাড় করেছি—তবু শীতের হাত থেকে পরিহ্রাণ নেই। ততদিনে ক্রিমের আমরা অভ্যস্ত হ’য়ে উঠেছি।

“ঘেসব সৈন্য আমাদের পাহারা দেয় তারা দিব্যি চর্যা চোস্ত খেতে পায়—চুরি করা মানে বেশ চবি আমিবেছে তারা। এরকম বাছাই করা

শরতানের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। নীচের কয়েকটা লাইন থেকে তাদের আনন্দ-উৎসবের ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। সকাল বেলা একজন কর্পোরাল এসে দোভাষীর মারফৎ ঘোষণা করতেন—এখনই বেশন দেওয়া হ'বে (বা ধার থেকে দেওয়া হবে সেটা)।

“কর্পোরাল চ'লে যেতেন। সক্ষম সমস্ত লোক ব'া ধারে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়াতে। তারপরে আমরা একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়েই আছি। শত শত কাম্পমান জীবন্ত কঙ্কাল হুই-কোটানো শীতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

“হঠাৎ উন্টো দিক থেকে জার্মানরা এসে পড়তো। কাঁটাতারের বেড়া টপকে তারা ঘোড়ার মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিতো। সমগ্র জনতা ক্ষুধায় পাগল হ'য়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। কর্দমাক্ত ঘোড়ার মাংসের টুকরো নিয়ে রীতিমত সংগ্রাম আর কি!

“জার্মানরা গর্জে উঠতো। বহুক্ষণ ধরে মেশিন গানের গুলির আওয়াজ, চীৎকার, যন্ত্রাধ্বনি—হতাহতদের ফেলে রেখে বন্দীরা এলো-পাখারিতাবে ব'া দিকে ছুটতো। -...শবুনের মত ফাট লেফটেন্যান্ট দোভাষীর সাথে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে হাসি চাপতে না পেরে ব'লতেন:

“আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, রেপশন বিতরণের সময় একটা ন্যাকারজনক কাণ্ড হুটী হ'য়েছে। কেবল এরকম ঘটলে তোগাদের রাশিয়ান শূরারদের সবাইকে নিদ্রিতাবে গুলি ক'রে মারবো। হতাহতদের সরিয়ে কেবো! অফিসারের পেছনের জার্মান গৈদ্যরা হাসতে হাসতে কেটে পড়তো। এই ধরনের আশ্রয় তারা ভালবাসত।

“ক্যাম্পের প্রাঙ্গণ থেকে নিঃশব্দে মৃতদের টেনে নিয়ে গিয়ে একটা খাদের মধ্যে তাদের কবর দিলাম।

“সেই ক্যাম্পে নিঃশব্দভাবে আমাদের পেটানো হতো। . . নিঃশব্দ

অবসাদ করার দূর জন্য এবং কখনও কখনও আমোদের জন্য আমাদের মারফ হ'তো। আমার ঘাটা শুকিয়ে আসছিলো—তারপর, একটানা ত্রাঁংসেঁতের জন্য অথবা মারের জন্য ঘাঘের মুখটা আবার হাঁ ক'রে ফেললো। যন্ত্রণা অসহ্য। কিন্তু, তবু সল্ল ক'রে চললাম সব কিছু—মুক্তির আশা তখনও লেগেই আছে কদমাস্ত মাটির ওপর আমাদের গুতে হতো—একগাছা খড়ও তারা আমাদের দেবে না। পরস্পরের পায়ে জড়াজড়ি ক'রে আমরা পড়ে থাকতাম। সারারাত ধরে ছট্‌কটানি। যারা একেবারে নীচে কাদার ওপর থাকতো তারা ঠাণ্ডায় জমে যেতো—আর যারা ওপরে থাকতো তাদেরও অনেকটা ওই অবস্থাই, ঘুম নেই, রিজ্জাম নেই, শুধু তীব্র যন্ত্রণা!

“এইভাবে দিন চললো যেন গভীর দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। প্রতিদিন আমি দুর্বল হ'য়ে পড়ছিলাম। একটা শিশুও আমাকে কাবু ক'রে ফেলতে পারত। মাঝে মাঝে চর্মসার শুকনো হাতের দিকে তাকিয়ে আতকে ভাবতাম, কেমন ক'রে এখান থেকে বেরবো? নিজেই কতই না শাপাস্ত করতাম, প্রথমেই কেন পালাই নি। আমাকে মেরে ফেললে এই বীভৎস অভ্যাচারের হাত থেকে তো বাঁচতাম।

“শীত এলো। তুষারের টুকরো সরিয়ে ঠাণ্ডায় জমাট মাটিতে আমরা গুতান। ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা কমে আসছে।.....শেষে জানানো হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কাজ ক'রতে পাঠানো হবে। সবাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম। সবার বুকে আশা মেগে উঠলো—যতই ক্লীণ হোক না কেন, তবু সেটা আশা, যে ভাবেই হোক, পালাবাব একটা স্বযোগ পাওয়া বাবে।

“সেই রাতটা খুবই নিশ্চল এবং তুষারচ্ছন্ন। ভোরের ঠিক আগেই কামাণের গর্জন শোনা গেলো। আমার আশেপাশের সবই সজাগ হ'য়ে উঠলো। আমার কামানের গর্জন শোনা গেলে কে একজন চাঁৎকার ক'রে উঠলো,

‘কমরেড্—আমাদের লেননারাই আক্রমণ করছে। এর পরে কি হ'লো সেটা প্রায় দুর্বোধ্য। সারা ক্যাম্প পায়ে তর ক'রে পাড়িয়েছে— এমন কি যারা দিনের পর দিন খাড়া হ'তে পারে নি তারাও। চারিধারে কিল্কিন্স্ আওরাজ্—চাপা ফোঁপানির শব্দ.....আমার কাছে একজন ঠিক মেয়েদের মত কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলো...আমিও...আমিও...”

তাতাতা ড ব'লতে লেফটেন্যান্ট জেরাসিমভের গলার স্বর অবকঙ্ক হ'য়ে পড়ল। একটু থেকে, নিজেকে সংযত করে তিনি শাস্তভাবে বলতে লাগলেন, “আমার গাল বেয়েও চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিলো, এবং কনকনে বাতাসে দে সব জন্মে যাচ্ছিলো... কে একজন দুর্বল স্বরে ‘ইটার ন্যাশনাল’ গাইছিলো ; আমরাও তাক্সা গলায় তার সাথে যোগ দিলাম। সেন্ট্রীর দল আমাদের উপর গুলি দাগতে আরম্ভ ক'রলো। হুম্ব হলো : ‘ভয়ে পড়!’ চিং হয়ে বরফের উপর চেপে আমি শিশুর মত কাঁদতে থাকলাম। হ্যা, সেটা গর্ব ও আনন্দের অঙ্গ— আমাদের দেশবাসীর জন্য গর্ব। জার্মানরা আমাদের মেয়ে ফেলতে পারত—বে রকম নিরস্ত্র এবং ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমরা— কিন্তু তারা আমাদের আত্মাকে চূর্ণ ক'রতে পারে নি—পারবেও না কখনও! স্পষ্টই ব'লছি, তারা তুল জায়গায় হাত দিয়েছে।”

*

*

*

সেই রাতে জেরাসিমভ্‌এর গল্পের শেষটুকু শুনেতে পাই নি। হেড্-কোয়ার্টার থেকে তাঁর জরুরী তলব হয়েছিল। কয়েকদিন পরে আবার আমাদের দেখা হয়। ডাগ্‌আউটে এক রকম উদ্ভিদের গছ বেরুচ্ছে, তার সাথে পাইনের নির্ধাসেরও। সামনের দিকে হুঁকে একখানা বেঞ্চ— তিনি বসে আছেন—আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে আঙ্গুল চুকানো। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, সম্ভবত বন্দীশালাতেও তিনি ঠিক ওই ভাবেই বসে পড়া বসে থাকতেন—আঙ্গুলগুলোও এমনি ভাবেই পরস্পর

পরস্পরে সংলগ্ন হয়ে থাকত—হয়ত এমনি নিস্তর, বিবর, ত্বিগহ, নিকল
চিহ্নায়ই তিনি ডুবে থাকতেন

“জানতে চাচ্ছেন, কি ভাবে আমি পালিয়েছিলাম ? শুধু তবে, ঘটনাটাই
এই ভাবে ঘটে। সেই রাত্রেই পরেই, কামানের আগুয়াজ শোনা বাবার
সময় থেকে, আমাদেরকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাদি গড়বার কাজে লেগে যেতে
হয়। তুষারপাতের পরেই একটা গরমের ভাব আসে। রুটি পড়ছিলো।
ক্যাম্প থেকে উত্তর দিকে আগাদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হ’লো।
পথের মধ্যে আগেকার ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ক্রান্তিতে অনেকে
টলে পড়লে তাদেরকে গুলি করে সেখানেই ফেলে রাখা হলো.....

“একজন লোক পথের মধ্যে একটা জমাট-বাঁধা আলু তুলতে গেলে
একজন জার্মান এন্. সি. ও. তাকে গুলি করল। একটা আলুর ক্ষেত
পার হচ্ছিলাম আমরা। গোকার নামে একজন ইউক্রেনিয়ান লোকের
ঝলসানো আলুটা তুলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। এন্. সি. ও. দেখে
সেটা। একটা কথাও না বলে গোকারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার
মাথার পেছন দিকটায় গুলি করে। দলটাকে আবার দাঁড় করিয়ে
লাইন বাঁধতে বলা হল। ‘এ সবই জার্মান সম্পত্তি।’ এন্. সি. ও. ব্যাখ্যা
ক’রতে লাগল—হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখাল। ‘বিনা
অন্তমত্টিতে গুর যে কোনটাতে হাত দিলেই গুলি করা হবে।’

“পথের মধ্যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হলো।
মেয়েরা আমাদের দেখতে পেয়েই, ছুটে এসে কুটি আর আলু সেক হুঁড়ে
দিতে লাগলো। কেউ কেউ সেগুলো তুলে নিতে পেরেছিলো—অনেকে
পারে নি। বাড়ীর জানালায় জানালায় গুলি চালানো হ’লো এবং
আমাদেরকে গতি বাড়াতে হুকুম করা হ’লো। কিন্তু ছেলের দল—
‘তাদের ভয় নেই। তারা দৌড়ে আগে গিয়ে রাস্তার মধ্যে কুটি রেখে
ছিলো—যাতে যেতে যেতে দেবী না ক’রেই আনরা তুলে দিতে পারি।

‘মনে আছে, একটা বড়ো সেক্স আলু আমি পেয়েছিলাম। সামনের লোকটার সাথে ভাগাভাগি করে খেলাম সেটা। খোসা শুকু সবই আমরা খেয়ে ফেললাম। এটা নিশ্চিত যে, সারা জীবনে এমন সুস্বাদু বাবার আর খাই নি।

‘আত্মরক্ষার যে দুর্গ গড়ে তোলার কাজে আমাদের লাগান হয়, সেটা বনের মধ্যে। রক্ষীর দল বাড়ানো হ’লো। কোদাল পেলাম আমরা এক একটা। কিন্তু এমন গড়ার কাজের কথা আমি ভাবিনি, আমি চিন্তা করছিলাম শুধু ধ্বংস করতে।

‘সেই দিন সন্ধ্যায় মন স্থির করে ফেললাম : যে গর্ত খোঁড়া চাচ্ছিলাম সেই গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে বাঁ হাতে কোদাল নিয়ে শাস্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেলাম……লক্ষ্য করেছি যে অন্যান্য জার্মানরা কিছু দূরে একটা খাদের কাছে আছে, এবং এই লোকটা ছাড়া আর কোন শাস্ত্রী কাছে কিনারে চোখে পড়লো না।

‘দেখো, আমার কোদালটা ভেঙ্গে গেছে—সৈন্যটার কাছে গিয়ে আন্তে আন্তে ব’ললাম। মাথার মধ্যে এক ঝলক চিন্তা খেলে গেলো যে, যদি আমি এক ঘায়েই তাকে ফেলে দেবার মত শক্তি না পাই তা হ’লে আমি গেছি। জার্মানটা আমার মুখে নিশ্চয়ই কিছু লক্ষ্য করেছে, কেন না, সে অটোমেটিকটা খুলে নেবার জন্যে কাঁপটা নাড়লো। তক্ষুনি আমি পূর্ণ শক্তিতে কোদালটা তার মুখে ছুঁড়ে মারলাম। মাথায় উন্মীষ ছিলো বলে সেখানে আঘাত করি নি। দেখলাম, তার মুখে আঘাত করার মত আমার যথেষ্ট শক্তি ছিলো এবং একটা টু শব্দ না করে সে চিৎ হ’য়ে পড়ে গেলো।……

‘এখন আমার হাতে একটা অটোমেটিক এবং তিন সার গুলি এসেছে। আমি ছুটতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম যে সে শক্তি আমার নেই। আমি থেমে গেলাম। একটু দূর নিয়ে আবার ধীরে ধীরে চলতে

লাগলাম। খাদের উন্টে। দিকের বনটা খুব গভীর। সেইজন্যে সেই দিকেই এগিয়ে চললাম। এখন মনে ক'রতে পারছি না, কতবার আমি প'ড়েছি, উঠেছি, আবার প'ড়ে গেছি তবু প্রতি যুগ্মে এগিয়ে চলেছি—মুখে কায়ার আভাস, ক্রান্তিতে শ্বাস রুদ্ধ—অবশেষে পাহাড়ের ওপারে এক ঝোপের দিকে চলেছি। হঠাৎ বহুদূরে পেছনে মেসিনগানের কড় কড় আওয়াজ, চীৎকাব, হৈ হুল্লোর। এখন আমাকে ধরাটা অত সোজা নয়।

‘শীগগিরই সন্ধ্যা আসছে। জার্মানরা যদি আসে—শেষ কার্ত্তজটা আমার জন্যেই রাখবে। সেই চিন্তায় একটু নিশ্চিন্ত হ'লাম। ঘীবে ঘীবে এবং খুব সতর্কভাবে আমি এগিয়ে চললাম।

‘রাতটা বনেই কাটলো। প্রায় আশমাইল দূরে একটা গ্রাম আছে—কিন্তু সেখানে যেতে ভয় হ'লো—পাছে আবার জার্মানদের হাতে পড়ি।

‘পরদিন কয়েকজন পার্টিজান (গেরিলা) আমাকে দেখতে পায়। শরীরে বল না হওয়া পর্যন্ত তাদের ডাগ আউটে আমি কয়েক সপ্তাহ থাকি। প্রথমে আমাকে তারা সন্দেহ করতে থাকে—কেননা, পার্টি কার্ড তাদের দেখাই নি। ক্যাম্প কোটের কঁাকে সেটা আমি সেলাই করে রাখি। কিন্তু পরে তাদের কাজে ভিড়ে পড়লে তাদের মনোভাব বদলায়। তখন থেকেই আমি নিহত জার্মানদের হিসাব রাখতে শুরু করি, এবং এখন পর্যন্ত সময়ে সেই হিসাব আমি রেখে আসছি ; সংগা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, প্রায় একশোর কাছাকাছি।

‘জানুয়ারীতে পার্টিজানরা গোপনে আমাকে সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় একমাস হাঁসপাতালে ছিলাম। সেখানে আমার কাঁধ থেকে স্প্রিংটার বের করা হয়—আব, ক্যাম্পের অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে—যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'বে। তারপরে

স্বপ্ন হবার জন্যে আমাকে বাড়ীতে পাঠানো হয়। এক সপ্তাহ বাড়ীতে ছিলাম। আর পারছিলাম না। ফিরে যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হুয়ে উঠলাম—যাই হোক না কেন, আমার স্থান এইখানেই শেষ পর্যন্ত।”

*

*

ভাগ আউটের প্রবেশ-পথে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমরা। স্মৃণালোকিত বনেন মাঝখানটায় ফাঁকা জায়গার দিকে চেয়ে জেরাসিমভ চিন্তিত ভাবে বললেন—.... “ঠিকভাবে যুক্ত ক’রতে আমরা শিখেছি, শিখেছি ঘৃণা করতে এবং ভালবাসতেও। যুক্তটা হচ্ছে একটা যাতার মত—সমস্ত ভাবধারাকে চূর্ণ ক’রে সূক্ষ্ম ক’রে ফেলে। ভাবতে পারেন, ঘৃণা আর ভালবাসা পাশাপাশি থাকতে পারে না। সেই পুরানো চলিত কথাটা জানেনই তো: ‘ঘোড়া আর তীর হরিণীকে এক জোয়ালে বেঁধে না।’ এখানে আপনি দুটোকে একই জোয়ালে বেশ ভালভাবে চলতে দেখছেন। তীর শুণা—জার্মানদের ওপর এই-ই আমার একমাত্র মনোভাব—তারা আমার দেশ এবং আমার ওপর যা ক’রেছে তারই জন্যে। কিন্তু, একই সাথে আমি আমার দেশবাসীকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি—তারা যেন কোনদিন জার্মান দাসত্বের যন্ত্রণা ভোগ না করে। এরই জন্যে আমরা সবাই দুর্দান্তভাবে লড়াই ক’রতে পারি—এই দুটো অসম্ভবত্ব বাজের মধ্য দিয়ে মৃত হয়ে আমাদের জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের ওপর ভালবাসা যদি আমাদের অন্তরে পুষ্ট হয়—এবং হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ না হচ্ছে পর্যন্ত সেটা হ’বেই—তাহলে বেয়নেটের আগায় ঘৃণার আগুণও আমরা বয়ে নিয়ে যাবই। মাপ করবেন, প্রকাশতকী যদি একটু বিশদও হয়ে পাকে, তবে মাপ করবেন আমাকে, আমি এইরকমই তাবি”! লেক-টেন্যান্ট জেরাসিমভ তাঁর কথা শেষ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের পর এই তাঁর মুখে প্রথম হাসি দেখলাম—শিশুর প্রাণ গোলা হাসি।

এইবার সব প্রথম লক্ষ্য করলাম যে বজ্রিশ বছরের এই লেকটেন্যান্ট, ষাঁর মুখে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে, অথচ ওক গাছেয় মতই ষাঁর কঠিন কাঠামো—ঊঁর মাথার রূপালি সাদা চুল ঝকঝক করছে। প্রচণ্ড নির্ধাতনের মধ্য দিয়ে সেই বারধ'কা, যেতত এমন পবিত্রতা লাভ ক'রেছে যে ঊঁর ট্রেক ক্যাপে জড়ানো সাদা মাকড়নার সাদা সূতোও সেই চকচকে মাথার কাছে রান হ'য়ে প'ড়েছে—চেষ্টা ক'রেও আমি আর ত্যর অন্তিম ধরতে পারছিলাম না।
